টেল মি ইওর ড্রিমস

সিডনি সেলডন

সূচিপত্র

এই কাহিনী বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে..2

সম্পত্তি বেচাকেনাকারী সংস্থা..57

এই কাহিনী বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে

০১.

কে ওর পিছু নিয়েছে? এমন হিংস্র অনুসরণকারীদের জগৎ আলাদা। তারা এক অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। সেই জগতের সঙ্গে অ্যাশলের কোন যোগাযোগই নেই। কে ওর ক্ষতি করতে চায়? এই আতঙ্ক তাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল অ্যাশলে। তবুও আজকাল রাতে সে শুধু দুঃস্বপ্ন দেখে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙে আতঙ্কের মধ্যে। অ্যাশলে ভাবে, হয়তো এসবই তার কল্পনা। বোধ হয় খুব বেশি পরিশ্রম করে ফেলছে। যার ভার শরীর নিতে পারছে না। একটা ছুটির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আয়নায় নিজের শরীরের প্রতিফলন দেখে অ্যাশলে। বুদ্ধিদীপ্ত দোহারা চেহারার মধ্যকুড়ির এক যুবতী। কাঁধের ওপর কালো চুলের রাশ। সে তন্বী, আকর্ষণীয়া। কিন্তু বাদামি চোখে উদ্বেগের ছাপ। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে সে রান্নাঘরের দিকে এগোয়। যা ঘটেছে সব ভুলতে চেষ্টা করে। টোস্ট, ওমলেট আর কফি নিয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না। উদ্বেগ তার খাওয়ার আগ্রহও কেড়ে নিয়েছে। রাগান্বিত হয়ে সে ভাবে–এটা চলতে দেওয়া যায় না। যেই হোক, আমার সঙ্গে এরকম করতে দিতে পারি না আমি।

অ্যাশলে ঘড়ি দেখে। এবার কাজে বেরোতে হবে। বেরোবার আগে সে তার সুন্দর করে সাজানো বাসস্থানটার দিকে একবার তাকায়। ভিয়া কামিনো ফোর্ট বহুতলের চারতলায় তার ফ্ল্যাট। ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যাপেরটিনোর এই ফ্ল্যাটটা অ্যাশলের খুব পছন্দের। সারা জীবন : সে এখানেই কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে সে অন্য

একটা বাসস্থান ঠিক করেছে নিজের জন্য। যাতে কেউ তার খোঁজ না পায়। ক্ষতি করতে না পারে। দরজাটা টেনে বন্ধ করে সে আবার টেনে দেখে নেয় যে সেটি ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কিনা। তারপর এলিভেটরে নিচে নেমে আসে। গ্যারাজটা নিস্তব্ধ, জনমানবশূন্য। এলিভেটরের দরজা থেকে ২০ গজ দূরে ওর গাড়িটা দাঁড় করানো রয়েছে। প্রায় ছুটে গিয়ে সে গাড়িতে উঠে যায়। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে। উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করে। ডাউনটাউনের দিকে গাড়ি ছুটতে থাকে। আকাশে ঘন মেঘ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস আজ প্রবল বৃষ্টি হবে। অ্যাশলে ভাবে আজ বৃষ্টি হবে না। সূর্য উঠবে। ভগবানের সঙ্গে একটা ডিল করে অ্যাশলে। যদি বৃষ্টি না হয়ে সূর্য ওঠে তবে বোঝা যাবে সব আগের মতই আছে। সব অ্যাশলের কল্পনা।

দশ মিনিট পরে অ্যাশলে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল প্যাটারসন ডাউনটাউন ক্যাপেরটিনোর রাস্তা দিয়ে। কয়েক বছর আগে এই রাস্তাটা ছিল নির্জন। আজ কমপিউটারের জাদুতে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আজ জায়গাটার নামই হয়ে গেছে সিলিকন ভ্যালি। অ্যাশলে এই কম্পিউটার ভ্যালির একটা কোম্পানি গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স করপোরেশন-এর একজন কর্মী। দুশো জন কর্মী এই কোম্পানির। সিলভারতে স্ট্রিট দিয়ে যাবার সময় তার মনে হল কেউ তার পিছু নিয়েছে। কেন? রিয়ার উইন্ডোতে চোখ রেখে কাউকে দেখা গেল না। যদিও সব স্বাভাবিক তবুও অ্যাশলের ইন্দ্রিয় যেন অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। এবার সে পৌঁছে গেল গ্লোবাল কম্পিউটারের অফিসে। পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে সে অফিসে ঢুকল।

তখনই বৃষ্টি শুরু হল। সকাল নটার মধ্যেই গ্লোবাল কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অফিসের প্রায় সবাই এসে গেছে। তার নাম ধরে কেউ ডাকল। তার ওপরওয়ালা শেন মিলার।

মিলার মধ্য তিরিশের সুঠাম পুরুষ। অ্যাশলে যখন নতুন চাকরিতে যোগ দেয় তখন মিলার তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে তোলবার অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। এখন হাল ছেড়ে দিয়ে তারা ভাল বন্ধু। অ্যাশলে ঘরে ঢুকতেই শেন একটা টাইম পত্রিকা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে,–একজন অতি বিখ্যাত বাবার সন্তান হতে কেমন লাগে অ্যাশলে?– অ্যাশলে হেসে বলে–দারুণ।– টাইম পত্রিকার প্রচ্ছদ ছবি ও ক্যাপশন, ডাঃ স্টিভেন প্যাটারসন। মিনি হার্ট সার্জারির জনক, মিলার বলে,–দেখতো, এর জন্য কিছু করতে পারো নাকি?– বলে একটা ছবি এগিয়ে দেয়। ছবিটা একজন চলচ্চিত্র তারকার। গ্লোবালের এক ক্লায়েন্ট একটা বিজ্ঞাপনে একে ব্যবহার করবে। কিন্তু ডেসিয়ের ১০ পাউন্ড ওজন বাড়িয়ে বসে। আছে। চোখের তলা ফোলা। দেখো যদি সামলাতে পারো।–

অ্যাশলে ছবিটার দিকে দেখে। বলে,–দেখে মনে হয় কিছু করা যাবে। নিজের টেবিলে চলে আসে সে। এই সংস্থার একজন গ্রাফিক ডিজাইনার সে। বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করে। তিরিশ মিনিট পরে তার মনে হল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল সে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, ডেনিস টিব্বলে। টিব্বলে গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কম্পিউটার জিনিয়াস। নিখুঁত কাজের জন্য অফিসে সে যাদুকর বলে পরিচিত। তিরিশ ছুঁই ছুঁই টিব্বলে রোগা, টাক মাথার অবদমিত ব্যক্তিত্বের মানুষ। গ্লোবাল-এ রটনা, টিব্বলে আর অ্যাশলের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ডেনিস টিব্বলে বলল,–সুপ্রভাত, কোন সাহায্যের দরকার আছে?–না, ধন্যবাদ।– অ্যাশলে জবাব দেয়। শনিবার রাতে আমরা কি একসঙ্গে ডিনার করতে পারি?

–না, ঐ দিন আমি ব্যস্ত থাকবো।– ডেনিস তির্যক হেসে বলে,–ব্যস্ত মানে তো বড়সাহেবের সঙ্গে রাতের খাওয়া আর...– অ্যাশলে ধমকে ওঠে। –এটা তোমার দেখার

দরকার নেই।– ডেনিস বলে,–ঐ লোকটার মধ্যে তুমি যে কী পাও তা জানি না। আমাকে সুযোগ দিয়ে দেখ। আমি ওর থেকে অনেক ভাল সঙ্গ দেব। আশা করি বুঝতে পারছ আমি কোন্ সঙ্গের কথা বলছি।–

অ্যাশলে অতি কষ্টে রাগ সংবরণ করে বলে,–আমার এখন অনেক কাজ ডেনিস, তুমি এখন এসো।–

ডেনিস ঝুঁকে পড়ে বলে,–তুমি বোধ হয় জান না, ডেনিস কখনও হাল ছাড়ে না।– বলে দ্রুত পায়ে চলে যায়। অ্যাশলের মনে হয় তবে কি ডেনিস তাকে অনুসরণ করে? সাড়ে বারোটায় ফাইলপত্র গুছিয়ে, কম্পিউটার বন্ধ করে সে উঠে পড়ে।

মার্গারিটা ডি রোমায় এসে পৌঁছে দেখে বাবা তখনও আসেনি। রেস্তোরাঁয় বেশ ভীড়। একটু পরেই তার বাবা ডাঃ স্টিভেন প্যাটারসন ওর টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। ডাঃ প্যাটারসন বহু বছর আগেই এমন এক হার্ট সার্জারি আবিষ্কার করেছিলেন যাতে কাটা ছেঁড়া, সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় খুব কম। সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পদ্ধতিটি। জনপ্রিয়তার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন ডাঃ প্যাটারসন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ডাক্তারদের। সংস্থা ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে নিজের আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে জানান, বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের সেই পদ্ধতিটি শেখানোর জন্য প্রায়ই ডাক আসত প্যাটারসনের। অ্যাশলের যখন বারো বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। তারপর থেকে তার জীবনে শুধুই বাবা। উল্টো দিকের চেয়ারে বসলেন প্যাটারসন।

প্যাটারসন হেসে বললেন, টাইম ম্যাগাজিনটা দেখেছ?– অ্যাশলে বলল,–শেন সকালে দেখাল।– ডাঃ প্যাটারসন রেগে গেলেন,–শেন তো তোমার অফিসের বড়সাহেব?–শেন একজন সুপার ভাইজার।–আমি ব্যক্তিগত আর ব্যবসায়িক, পেশাদার আর মানবিক বিষয় এক করে ফেলায় পক্ষপাতী নই। তুমি ওর সঙ্গে সামাজিক ভাবে মেলামেশা করছ তো? এটা ভুল করছ।–

অ্যাশলে বাধা দিয়ে বলে,–আমরা দুজনে শুধুমাত্র ভাল বন্ধু।– তখনই একজন ওয়েটার এগিয়ে আসে ...ডাঃ প্যাটারসন তাকে রূঢ়ভাবে ধমক দেন–যতক্ষণ না আপনাকে ডাকা হচ্ছে এদিকে ঘেঁষবেন না– নোকটা লজ্জিত হয়ে দ্রুত সরে যায়। অ্যাশলে তার বাবার ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করে। ডাঃ প্যাটারসন এরকমই বদমেজাজি। একবার অপারেশন থিয়েটারে এক সহকারী জুনিয়ার ডাক্তার ভুল করায় ঘুষি মেরে তার ঠোঁট ফাটিয়ে দেন বাবা। ও.টির ভেতরেই। ছোটবেলায় বাবা-মার তীব্র ঝগড়ার চিৎকারগুলো এখনও অ্যাশলের কানে বাজে। ঐ ছোটবেলায় মা-বাবার ঝগড়ার কারণ না বুঝলেও তার মন বিপর্যস্ত হয়ে থাকত। ডাঃ প্যাটারসন আবার কথা শুরু করেন,–শেন মিলারের সঙ্গে মেলামেশা করাটা তোমার ভুল হচ্ছে।–

কথাগুলো যেন প্রতিধ্বনি হয়ে বাজে অ্যাশলের কানে। বহু বছর আগে শোনা কথাগুলো যেন তার কানে ভেসে এল- ওর বাবার কথা, জিম ক্লেয়ারির সঙ্গে মেলামেশা করাটা তোমার ভুল হচ্ছে।– অ্যাশলে তখন পেনসিলভিনিয়া বেডফোর্ড স্কুলে পড়ে। বয়স তখন আঠারো। বেডফোর্ডের জনপ্রিয়তম ও সেরা ছাত্র ছিল জিম ক্লেয়ারি। ফুটবল অধিনায়ক, হ্যান্ডসাম আর নারীঘাতী হাসি ছিল ওর। স্কুলের প্রতিটি মেয়েই তার সঙ্গে বিছানায় যেতে উদগ্রীব ছিল। সেই জিম যে কেন কিভাবে অ্যাশলের প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠল।

জিমের সঙ্গে ডেট করার সময় অ্যাশলে স্থির করেই রেখেছিল যে ওর সঙ্গে বিছানায় যাবে না। কারণ অ্যাশলে ভাবত শুধু শারীরিক কারণেই জিম তার সঙ্গে মিশছে। কিন্তু ক্রমশ সে বুঝতে পারে জিম ও তার চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা, আদর্শ সব একরকম ছিল।

একদিন ডাঃ প্যাটারসন মেয়েকে বললেন,–ঐ ছোরার সঙ্গে তুমি বড্ড বেশি। মেলামেশা করছো আজকাল।–

অ্যাশলে বলল,–হ্যাঁ বাবা, জিম খুব ভাল ছেলে। আমরা দুজন পরস্পরকে ভালবাসি। আলাপ করলে তোমারও ভাল লাগবে।– ডাঃ প্যাটারসন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর ক্রোধ মেশানো গলায় বললেন,–কী করে ঐ ছোকরাটাকে বিয়ে করার কথা ভাবো তুমি। একজন সামান্য ফুটবল খেলোয়াড়। ও কি তোমার উপযুক্ত? তুমি আমার মেয়ে। তোমার উপযুক্ত পাত্র কী ঐ ছোকরা?– এটা অবশ্য নতুন ব্যাপার নয়। জিমের আগে এবং পরে যত জন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটেছে সবার সম্বন্ধেই ঐ একই মত ছিল প্যাটারসনের।

স্কুলের গ্র্যাজুয়েশন পার্টি এগিয়ে আসছিল। জিম ওকে সুখবরটা দিল তখন যখন ওর কাকা শিকাগোতে ওর জন্য একটা ভাল চাকরি জোগাড় করেছে। আমরা শিকাগো চলে যাব। অ্যাশলে নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যায় কারণ তার বাবা যে রাজি হবেন না তা নিশ্চিত। তবে অ্যাশলেও ওর জীবন নিয়ে বাবাকে ছিনিমিনি খেলতে দেবেন না। কিন্তু অ্যাশলে বুঝতে পারেনি তার বাবা কত ধুরন্ধর। স্কুল লিভিং গ্র্যাজুয়েশন পার্টির পরদিন সকালের বিমানে মেয়েকে নিয়ে লন্ডনের পথে রওনা হলেন ডাঃ প্যাটারসন। লন্ডনের কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেই কলেজে পড়ার সময়ই অ্যাশলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে কমপিউটার নিয়ে উন্নত ধরনের পড়াশোনার কোর্স করবে। ক্যালিফোর্নিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সম্মানজনক সেই ওয়াং স্কলারশিপ ফর ওম্যান ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য আবেদন করল এবং নির্বাচিত হল। তিন বছর সেখানে কম্পিউটার অ্যাডভান্স কোর্স বিষয়ে পড়াশোনা করার পর গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্স করপোরেশনের চাকরিতে যোগ দিল।

সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার পথে অ্যাপেল ট্রি বুক হাউসের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করায়। দোকানে ঢোকবার আগে থমকে দাঁড়ায়। কাঁচের দরজায় চোখ রেখে দেখে কেউ তাকে। অনুসরণ করছে কিনা। বইয়ের দোকানে ঢুকতেই এক যুবক কর্মচারী এগিয়ে আসে। অ্যাশলে তাকে বলে অনুসরণকারী বিষয়ে কোন বই আছে কিনা বিক্রেতা বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। অ্যাশলে ভুল বুঝতে পেরে বলে,–আফ্রিকার জন্তু জানোয়ার আর বাগান পরিচর‍্যা বিষয়ক বইও দেখাবেন।–

অ্যাশলে বাড়ির পথে যাবার সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গাড়ির গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলকণা যেন অ্যাশলের কানে হিসহিস করতে থাকে–সে ঠিক ধরবে... তোমায় ধরবে... ধরবে তোমায়। গ্যারাজে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এলিভেটর বেয়ে ওপরে উঠে আসে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে চমকে যায়। সারা ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি আলো জ্বলছে।

.

০২.

All around the mulberry lush
the monkey chosed the weasel

the monkey though it was all in fun
pop goes the weasel–

গানটা টোনি প্রেসকট-এর খুবই পছন্দ। তার মা এই গানটা খুব অপছন্দ করে। –ঐ বস্তাপচা গানটা তোমার বেসুরো গলায় আর গেয়ো না। বন্ধ করো।–ঠিক আছে মা,– টোনি অবশ্য গানটা না থামিয়ে স্বগতোক্তির মত গেয়ে চলে। মায়ের বিরক্তিতে সে খুশি হয়। বাইশ বছরের টোনি প্রেসকট একজন আধুনিক আমেরিকান যুবতী। প্রাণবন্ত, দুষ্টুমিতে ভরপুর। বোমার মত বিস্ফোরক ওর চরিত্র। হৃদয়াকৃতির মুখ ওর। চঞ্চল বাদামি দুই চোখ। শারীরিক গঠন উত্তেজক। লন্ডনে জন্ম হওয়ায় ওর ইংরেজিতে মনোরম এক বৃটিশ উচ্চারণ ভঙ্গি মিশে থাকে। বরফের পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়া, স্কি এবং আইস স্কেটিং ওর প্রিয় খেলা। টোনি গ্লোবাল কম্পিউটার গ্রাফিক্সের চাকরিটাকে খুব অপছন্দ করে। কিন্তু তবুও চাকরি তো করে যেতে হয়। বিশেষ করে মাইনেটা যখন ভাল। টোনি রাতের জীবন খুব পছন্দ করে। দিনের বেলা রক্ষণশীল পোশাক পরলেও রাতে সে মিনি স্কার্ট, হট প্যান্ট, কাধবিহীন ব্লাউজ বা স্ট্র্যাপ গেঞ্জি ব্যবহার করে। ক্যামডেন হাই স্ট্রিটে ইলেকট্রিক বলরুম আর সাবটেরিনিয়াতে লিওপার্ক লাউঞ্জ এই দুটো নাইটক্লাবে যেতে ও পছন্দ করে। সে রাতেও এক উদ্দাম নাচের পর একটা চেয়ারে বসেছে টোনি। এমন সময় এক যুবক এসে বলে,–আপনি তো দারুণ নাচেন।– টোনি ফিরে তাকায়। এ সব ক্লাবে এই ধরনের ব্যাপার ঘটেই থাকে। এভাবেই ডেট খুঁজে নেয় যুবক যুবতীরা। টোনি বলে,–ধন্যবাদ।–

–আপনার জন্য কোন পানীয় বলতে পারি।

–নিশ্চয়ই–। পানীয়ে চুমুক দিয়ে যুবকটি বলে,–আমার একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট আছে। আমরা রাতটা তো সেখানে কাটাতে পারি।– টোনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়–আমি রাতটা নিজের বিছানায় কাটাতে বেশি ভালবাসি।–

তারপর লন্ডন ছেড়ে ওরা চলে এল ক্যাপেরটিনোয়। তবে লন্ডনের মত আবেগ, উচ্ছলতা নেই এখানে। বড় কৃত্রিম এখানকার সব কিছু। এখানকার নাইটক্লাবগুলোয় টোনির যাতায়াত থাকলেও লন্ডনের মত স্বতঃস্ফূর্ততা সে খুঁজে পায়নি। তার ওপরে এই অপছন্দের চাকরি। প্লাগ ইন, ডিপিআই, হাফটোন, গ্রিডস শুনতে শুনতে দিন কাটিয়ে সন্ধে থেকে সারারাত তার কাছে যেন আরও অসহ্যের হয়ে ওঠে। লন্ডনের উত্তেজক নৈশজীবন কি ভীষণ মিস করছে সে। নিজের একঘেয়েমি কাটাতে নাইটক্লাবের পিয়ানোতে গিয়ে বসে। গান গায়। ডিসকো বা নাইট ক্লাবে হাজির যুবকযুবতীরা ওর গান পছন্দই করে। কিন্তু মা বলে টোনি বেসুরো গান গায়।

এক রাতে পিত্রজৎস-তে মালিক ওর খাওয়া ও মদ্যপানের দাম নিল না। বলল তার অসাধারণ গানের জন্য এটা সম্মান দক্ষিণা। আবার আসতে অনুরোধ করল। মা যদি শুনতে পেত কথাগুলো।

এক শনিবারের রাতে স্নিফ হোটেলের ডিনার রুমে রাতের খাওয়া সারার পর টোনির মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছিল। টোনি ডায়াসে উঠে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কোল পোর্টার এর একটা গান গায়। প্রবল হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করা হয় তাকে। টোনি চেয়ারে ফিরে আসতে যাচ্ছিল। কিন্তু চারদিকের ভোজন ও পানরতদের অনুরোধে ওকে আরও দুটো গান গাইতে হল। টেবিলে ফিরে আসতেই এক টাক মাথা মধ্য চল্লিশের

পুরুষ এসে বসার অনুমতি চায়। বসে বলে,–আমার নাম নরম্যান জিমারম্যান। আমি নাটকের প্রযোজক। আমি একটা সঙ্গীত নাটক মঞ্চে নামাতে চলেছি। সেই বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।–

টোনি ওনার সম্বন্ধে কাগজ, পত্রপত্রিকায় প্রচুর পড়েছে। আপনার গলা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমার নতুন সঙ্গীত নাটক কিং অ্যান্ড আইতে অভিনয় করবেন? ব্রডওয়ে।– । মা কি শুনতে পাচ্ছ? জিমারম্যান জানতে চায় কবে অডিশন দিতে পারবে সে? –দুঃখিত, সম্ভব হবে না।–

জিমারম্যান বিস্মিত হয়ে গেলেন। নামি দামি অভিনেতা অভিনেত্রীরাও তার নাটকে অভিনয় করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে, আর এ প্রস্তাব পেয়ে ও প্রত্যাখ্যান করছে? জিমারম্যান বললেন,–আপনার সামনে হাজারটা সুযোগ এনে দিতে পারে এই নাটকের অভিনয়।–আমি একটা চাকরি করি।–কী চাকরি?–একটা কম্পিউটার সংস্থায়।– আমি জোর দিয়ে বলছি ঐ সংস্থায় আপনি যা মাইনে পান তার তিনগুণ রোজগার করতে পারবেন এখানে।– টোনি বলে,–জানি–। –তবে আপনি কী শো বিজনেসে আগ্রহী নন?– টোনি বলে,–আমি আগ্রহী। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমায় মাঝপথে সরে দাঁড়াতে হবে।–কেন? আপনার স্বামী কি বাধা দেবেন?—

আমি অবিবাহিতা।– এবার জিমারম্যানকে বিরক্ত দেখায়–আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, আপনার আপত্তিটা কোথায়?–আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি। । বলতে পারেন এক অভিশাপ যা আমাকে সারাজীবন বহন করে বেড়াতে হবে।–

টোনি ইন্টারনেট বিষয়ে জানল গ্লোবালে চাকরি করতে করতেই। সারা পৃথিবীর পুরুষদের খোঁজ পাওয়া ও আলাপ করার এক সুযোগ। একদিন সহকর্মী ক্যাথি হিলিং এর সঙ্গে ডিউক রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে গিয়েছিল। তাকে বলল,–আমাকে ইন্টারনেট ব্যবহারটা শিখিয়ে দেবে?– পরদিন দুপুরের খাবারের ছুটির ফাঁকে ক্যাথির কেবিনে গিয়ে হাজির হল। সবাই লাঞ্চ খেতে গেছে। ইন্টারনেট আইকন ক্লিক করার পর ক্যাথি তার পাসওয়ার্ক এন্টার করে সংযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর আরেকটি আইকনে ডাবল ক্লিক করে চ্যাটরুমে ঢুকল। টোনি দেখল টাইপ হওয়া অক্ষরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে বসে থাকা দুটি মানুষের আলাপচারিতা, টোনির চোখের সামনে অন্য একটা পৃথিবীর দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

কয়েকদিনের মধ্যে টোনি তার ফ্ল্যাটে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটা কম্পিউটার বসালো।

এরপর অফিস থেকে ফিরে ইন্টারনেটে বসতে শুরু করল। জীবন এক অন্য খাতে বইতে শুরু করল। পাল্টে গেল চেনা জীবন। আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে ভরা জীবন নয় তার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেন সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে সে। সে রাতেও টাইপ করলে পর্দার নীল চৌকো ফ্রেম জুড়ে বেগুণী অক্ষর ভেসে ওঠে। –হ্যালো আমি টোনি। কেউ কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?– কয়েক মুহূর্ত বাদেই পর্দায় ভেসে ওঠে,–হাই আমি বব। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।– পুরো পৃথিবীর সাথে সাক্ষাতের জন্য টোনি এখন প্রস্তুত।

–হল্যান্ডের হানস নিস্টেলরয়। আমি একজন ডিজে। থাকি আমস্টারডামে। আমার রাত জাগা জীবনটা উন্মুক্ত জঙ্গলের মত। অনিশ্চিত জীবন আমার।– টোনি এবার টাইপ

করে–কী উত্তেজক জীবন। আমি নিজেও গাইতে, নাচতে ভালবাসি, কিন্তু আমার শহরে অল্প কটা নাইটক্লাব আর ডিস্কো। খুবই অসহ্য জীবন আমার।–

–আমি তোমার এক ঘেয়েমি কাটাতে পারি কী?

–নিশ্চয়ই। এবার ঘন ঘন আমাদের চ্যাট হবে।

–বাই। শুভরাত্রি।

— দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল অ্যালকট।

পশ্চিম জার্মানির গ্রেফি ফ্রিগ্রাউজ।

আর্জেন্টিনার মালদানো ভাসকুয়েজ আলমাও।

ডাবলিন-এর ঘন গারবল্ডি।

প্রতিটা রাতই আলাদা রকমের উত্তেজক। একরাতে সে ফ্রান্সের জঁ ক্লদ পেরেত ফ্রান্স থেকে পেয়ে গেল। দ্রুত তাদের বন্ধুত্ব জমে উঠল। পারী শহরের উত্তেজক নৈশ জীবনের কাহিনী শোনোতোজ। অফিস থেকে ফিরে সে জঁ-এর সঙ্গে চ্যাট করতে বসে যেত। জঁ একটা জুয়েলারি শপের মালিক। বেড়াতে ভালবাসে। একবার কমপিউটারে স্ক্যান করে নিজের একটা ছবি পাঠায় টোনিকে। এক আকর্ষণীয় চেহারার মধ্যে কুড়ির যুবক। টোনিও তার ছবি পাঠায়। জ জানায় সে একজন সুন্দরী, আকর্ষণীয়া যুবতী। পারী চলে এস। টোনি জানায় যাবে।

পরদিন অফিসে ঢুকেই দেখল শেন মিলার অ্যাশলে প্যাটারসনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করছে। বিরক্ত হয় টোনি। মিলারের মত সুপুরুষ ঐ মানসিক রোগী অ্যাশলের মধ্যে কী পায় কে জানে। হতাশাগ্রস্ত, প্রাণহীন মেয়ে। কোন যুবতী মেয়ে রাতে বাড়ি ফিরে একা বসে বই পড়ে, হিস্ট্রি চ্যানেল অথবা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল দেখে ভাবা যায়? নৈশজীবন বলে কিছু নেই। পুরুষদের সঙ্গে মেশে না। এরকম একজন মেয়ের পেছনে মিলারের মত প্রাণবন্ত সুপুরুষ কেন যে লেগে আছে কে জানে। অ্যাশলে নিশ্চয়ই ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে চ্যাট করেনি কখনও। কি যে হারাচ্ছে নিজেই। জানে না। টোনির হঠাৎ মনে হল তার মা নিশ্চয়ই ইন্টারনেটকে ঘৃণা করত। কারণ মা সবকিছুকেই ঘৃণা করত, মা শুধু চিৎকার আর ঘ্যানঘ্যান করতেই জানত।

টোনিকে কখনই মা সহ্য করতে পারেন নি। –তুমি একটা অপদার্থ, বোকা–, এই ছিল মায়ের কথা। টোনির মনে পড়ে যায় সেই দুর্ঘটনার কথা যাতে মা মারা গিয়েছিল। টোনির কানে বাজে মায়ের সাহায্য চেয়ে কাতর আর্তনাদ।

–A penny for a spool of thread
A penny for a needly
That the way money goes,
Pop! goes the weasel–.

.

০৩.

অলিটটে পিটার্স একজন সফল চিত্রশিল্পী হতে পারত। রং সম্বন্ধে ওর একটা সূক্ষ্ম বোধ ছিল। রঙের গন্ধ পেত সে। শুনতে পেত। ওর বাবার কণ্ঠস্বর কখনও গভীর লাল, কখনও গভীর নীল। মায়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় বাদামি। শিক্ষিকার কণ্ঠস্বর সর্বদাই হলুদ। বাতাসের শব্দের রং সবুজ। প্রবাহমান জলের স্রোতের রং ধূসর।

কুড়ি বছরের অলিটটে পিটার্স এমন এক নারী যার সৌন্দর্য কখনও অতি সাধারণ, কখনও চোখ ধাঁধানো, কখনও নরম, কখনও শিহরণ জাগানো হতে পারে। তার মনমেজাজ মর্জির ওপর নির্ভর করে তার সৌন্দর্য। ও নিজের সম্পর্কে অতিসচেতন নয়। নম্র, লাজুক, মৃদু ভাষী এক যুবতী। রোমে জন্ম হওয়ার কারণে তার কথার ঢঙে ইতালিয় ছন্দ। ইতালি যেন ওর ব্যক্তিগত। প্রাচীণ মন্দির আর কলোসিয়ামগুলোতে একা যখন ঘুরে বেড়ায় অলিটটে বুঝতে পারে সে ওইগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে যখন পিয়াজা নভোনা, সেন্ট পিটার্স, বাসিলকা অথবা ভ্যাটিকান মিউজিয়াম বা বার্থেজ গ্যালারিতে ঘুরে বেড়ায় তখন চারপাশের মানুষজনের ভীড়, কথাবার্তার থেকে অনেক আপন মনে হয় ঐ প্রাচীনত্ব। রাফেল বা ফ্রা বার্টোলো মোমেনের আঁকা প্রাচীন যুগের ছবিগুলি মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে ওর শরীরে শিহরণ জাগে। ওর মনে হয় ঐ ষোড়শ শতকে ও ছিল, আর চিত্রকর হয়ে ওঠার অদম্য বাসনাটা ওর মধ্যে জেগে ওঠে। মায়ের বাদামি কণ্ঠস্বর কানে আসে–কেন কাগজ আর রং নষ্ট করছ। চিত্রকর হতে তুমি পারবে না।–

ক্যালিফোর্নিয়া এসে প্রথম দিকে মানিয়ে নেবার একটু সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপেরটিনো শহরটার নির্জনতায় সে মুগ্ধ হল। গ্লোবাল কম্পিউটারের চাকরিটা ওকে

প্রয়োজনীয় আর্থিক নিরাপত্তা দিল। শহরটায় কোন বড় শিল্পকলা ছিল না। তাই সপ্তাহ শেষে অলিটটে বেরিয়ে পড়ত। ওর সহকর্মী টোনি তাই নিয়ে ওকে তাচ্ছিল্য করত। নাইট ক্লাবে যেতে বলত। অবশ্যই অলিটটে সে কথায় কান দেয়নি।

অলিটটে ছিল ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ। চরম একাকীত্ব ও বিপন্নতাবোধে ভুগত সে। অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবত নিজেকে। ওর মন যে কখন পাল্টাতে শুরু করবে তা সে নিজেও জানত না। খুব উচ্ছল মেজাজ থেকে নিমেষে তীব্র হতাশা আচ্ছন্নতায় তলিয়ে যেত সে। নিজের আবেগের ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। টোনিকে সে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। টোনি বলেছিল, আমার সঙ্গে নাইটক্লাবে চলো। জীবনকে উপভোগ করো। অ্যাশলে প্যাটারসনের দিকে চোখ পড়তেই টোনি বলেছিল,–ঐ কুত্তীটা হল হিম বরফের রানি।– ঘেন্না আর রাগ মেশানো টকটকে লাল (অলিটটে রংটা দেখতে পায়) কণ্ঠস্বরে বলে সে। অলিটটে বলে,–ও খুব সিরিয়াস। কী করে হাসতে হয় কারো ওকে শেখানো উচিত।– টোনি বলে,–কী করে কাঁদতে হয়, তাও ওকে শিখিয়ে দেওয়া উচিত।–

এক শনিবার রাতে সানফ্রান্সিসকোর গৃহহীনদের সাহায্যার্থে আয়োজিত রাতের ভোজসভায় অলিটটে হাজির ছিল। সেখানে এক বৃদ্ধা হুইল চেয়ারে বসেছিলেন। অলিটটে এগিয়ে এসে তাকে ভোজটেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে প্লেটে খাবার তুলে দেয়। বৃদ্ধা স্নেহের হলুদ রংয়ের (অলিটটে দেখতে পায়) স্বরে বলেন,–ধন্যবাদ। আমার মেয়ে থাকলে আমি চাইতাম সে যেন তোমার মত হয়। এই প্রশংসা শুনে অলিটটে বলে,– তোমার মেয়ে তোমারই মতো সুন্দরী হত।– অলিটটের সারা শরীরে তীব্র কাঁপুনি জাগে। হিংস্র লাল এই স্বর কখনো তো জেগে ওঠেনি তার মধ্যে? সে রাতে বারবার ব্যাপারটা ঘটতে থাকায় ভীত হয়ে পড়ে সে। তার পরেও ঐ ধরনের হিংস্র চেতনার প্রতিফলন

ঘটতে থাকে ওর মনের ভেতর। যেন অচেনা কেউ মনের ভেতর থেকে কথাগুলো বলছে।

কেটি হার্ডির সঙ্গে কেনাকাটা করতে গিয়েছিল সে। একটা দোকানের শো-কেসের ঝোলানো পোশাক দেখে কেটি বলে,–কি সুন্দর!– অলিটটে দারুণ– বলে। কিন্তু শুনতে পায় ওর মন থেকে কেউ বলছে,–এই কুৎসিত পোশাকটা তোমার পরার পক্ষে আদর্শ।– এক সন্ধেয় অফিস থেকে ফিরে প্রতিবেশী রোনাল্ড-এর সঙ্গে রাতের খাওয়া সারতে বের হয়েছিল। সুস্বাদু, দামি খাবার খাওয়ার সময় রোনাল্ড বলেছিল–আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি আসাতে। আমরা এবার থেকে এরকম মাঝে মাঝে আসব।– অলিটটে বলে,–নিশ্চয় আসব।– কিন্তু শুনতে পায় ওর মন বলছে–বোকা, জঘন্য, নোংরা কুত্তা। তোর পাশে বসে খেতেও ঘেন্না করে।– আতঙ্কে অলিটটের সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে। তখন প্রতিপদে সামান্য কারণেই বন্য রাগে ফেটে পড়ে সে। একদিন সকালে অফিস যাবার পথে একটা গাড়ি সামান্য স্পর্শ করে ওকে। শরীরে তীব্র রাগের দাপাদাপি টের পায় সে। –বেজন্মার বাচ্চা, খুন করব তোকে।–

উদ্ভট নানা চিন্তায় ওর মন ভরে ওঠে। যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তারা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে। পরিচিত কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কেউ খুন হচ্ছে। দৃশ্যগুলি সে বিস্তারিতভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আর তখন আনন্দে ওর মন ভরে ওঠে। তারপর স্বাভাবিকতায় ফিরে এসে লজ্জিত বোধ করে নিজের ঐ প্রবৃত্তির জন্য। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে সে নম্র, ভদ্র, সহানুভূতিশীল, বিনয়ী, সর্বদা আতঙ্কিত হয়ে থাকে সে। কখন আবার ঐ হিংস্র মানসিক রোগে আক্রান্ত হবে। দ্বিতীয় কোন এক অবচেতনে হারিয়ে যাবে। বাধা দিতে পারবে না।

প্রত্যেক রবিবার সকালে গির্জায় যায় অলিটটে। নানা সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেয়। যেমন অনাথ শিশুদের জন্য অর্থ সংগ্রহ। সেদিন অলিটটে নিজের কয়েকটা ছবি নিয়ে এসেছিল। সেগুলো কেউ কিনবে সে ভাবেনি। পাত্রী সেলভাজ্জিও ছবিগুলো দেখে আপ্লুত হয়ে গেলেন। ঐদিন গির্জায় হাজির সকলেই খুব প্রশংসা করলেন ছবিগুলোর। আর্ট গ্যালারিতে দেওয়া উচিত ছিল বললেন সকলে। সেদিন বিকেলের মধ্যেই ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেল। অলিটটে বলে,–মা তুমি কী শুনতে পাচ্ছ?– শনিবারে অফিস থেকে ফিরে অলিটটে সানফ্রানসিসকো বা অন্য কোন বড় শহরে বের হয়ে পড়ত। রবিবার সারাটা দিন শহরের আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে বেড়াত। অনেক তরুণ শিল্পী গ্যালারিতে দর্শকদের সামনেই ছবি আঁকত। এরকমই একজনের দিকে নজর পড়ল অলিটটের। রংয়ের জ্ঞান প্রচুর। বেশ ভাল হাত। মন দিয়ে তার কাজ দেখতে থাকে অলিটটে। লোকটার ওর দিকে তাকায়। হাসে। জর্জিয়া ওকিফির পিটুনিয়া ছবির নকলটা আঁকছিল সে। প্রশ্ন করে,–কেমন হচ্ছে?– অলিটটে জবাব দেয়,–দারুণ।– উত্তরটা দিয়েই ভাবে কখন মনের ভেতর থেকে ভেসে আসবে মূর্খ, জঘন্য, অপেশাদার, কাঁচা হাতের কাজ। সেরকম কিছু কিন্তু ঘটল না। ধন্যবাদ, আমার নাম রিচার্ড মেলটন।–আমি অলিটটে পিটার্স। আপনি কি প্রায়ই আসেন এখানে?–যা, আপনি কোথায় থাকেন?–কাপেরটিনো।– যম, সেটা তোর জানার দরকার কী? –এরকম কোন উত্তর এল না মনের ভেতর থেকে। কিন্তু কেন?

রিচার্ড মনোযোগ দিয়ে আঁকতে থাকে। অলিটটে দেখতে থাকে লম্বা চেহারার, নীল চোখ, কোঁকড়া চুলের মধ্য কুড়ির যুবকটিকে। রিচার্ড একসময় বলে,–আমার খিদে পেয়েছে। চলো কিছু খাই।–ধন্যবাদ, চলুন।– অলিটটে এবার ভাবে মনের ভেতর থেকে ভেসে

আসবে–অচেনা, জঘন্য, নোংরা পুরুষদের সঙ্গে আমি খেতে চাই না। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। ব্যাপারটা কী? কাছের একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেতে খেতে মহান চিত্রকরদের ছবির বিষয়ে আলোচনা করতে থাকে। গোটা সময়ে একবারও অলিটটে মনের গহন থেকে নর্থক স্বরটা শুনতে পায় না। একটি নীল চোখের লম্বা চুলের, লম্বা যুবক এগিয়ে আসে ওদের দিকে। রিচার্ড আলাপ করায়,–এ হচ্ছে গ্যারি। আমার ছোটবেলার বন্ধু। আর ইনি অলিটটে পিটার্স।– পরিচয় শেষ করেই গ্যারি অন্য কাজে চলে যায়। আরো ঘণ্টা দুয়েক রিচার্ডের সঙ্গে কাটিয়ে অলিটটে ফিরে আসে। রিচার্ড বলে,–আবার কি আমাদের দেখা হবে?–

নিশ্চয়ই,– সেই রাতেই টোনিকে রিচার্ডের কথা বলে সে। টোনি বলে,–কোন শিল্পীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তার আঁকা ফলের ছবি খেয়েই কাটাতে হবে।–

অলিটটে বলে,–আমার রিচার্ডকে ভাল লেগেছে।–

দীর্ঘ চল্লিশ বছর চাকরি করার পর পাস্তুর ফ্রাঙ্ক-এর অবসরের দিন এসে পড়ল। ওর সহকর্মীদের মন খারাপ। গোপনে তারা আলোচনায় বসল। কী উপহার দেওয়া যায় পাস্তুর কে? ঘড়ি, ফুলদানি, বাঁধানো ছবি, ছুটি কাটানোর বিমান টিকিট? কেউ বলল ফ্রাঙ্ক ছবি খুব পছন্দ করে। ওকে একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়ে উপহার দিলে ভাল হয়। অলিটটে কি এঁকে দেবে? অলিটটে আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়। ওয়াল্টার ম্যানিং হলেন দফতরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মী। তিনি কারো প্রশংসা সহ্য করতে পারেন না।

তিনি বললেন,–আমার মেয়েও খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। কাজটা ও-ই করুক।– সহকর্মীদের একজন বলে,–দুজনেই আঁকুক। যারটা ভাল হবে তারটাই পাস্তুরকে দেওয়া হবে।–

পাঁচ দিনে অলিটটে ফ্রাঙ্ক পাস্তুরের প্রতিকৃতি এঁকে ফেলল। সহকর্মীরা এই দুর্দান্ত ছবিটাই পাস্তুরকে দিতে মনস্থ করল। ওয়াল্টার ম্যানিং বললেন,–আমি প্রতিবাদ করছি। আমার মেয়ে উদারতা বশত ছবিটা এঁকে দিয়েছে। তাই তার ছবিটাই দেওয়া হোক। সে একজন পেশাদার শিল্পী। হয় তার আঁকা ছবিটাই দেওয়া হোক পাস্তুরকে নয়ত কোন ছবিই দেওয়া হবে না।– ঘরের পরিবেশটা থমথমে হয়ে উঠল। প্রবল তর্কাতর্কি শুরু হল। অলিটটে বলল,–আমার মতে ওয়াল্টার সাহেবের মেয়ের আঁকা ছবিটাই পাস্তুরকে দেওয়া হোক।– ম্যানিং বিজয়ীর হাসি হেসে বলেন,–এতে আমার মেয়েকে প্রাপ্য সম্মান দেখানো হবে।–

সেদিনই অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত গাড়ির তলায় চাপা পড়ে ওয়াল্টার ম্যানিং মারা যান। পরের দিন অফিসে গিয়ে খবরটা শুনে অলিটটে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

.

০৪.

অফিসের যদিও দেরি আছে তাও অ্যাশলে দ্রুত স্নান সারছিল। ঠিক তখনই দরজাটা খোলার বা বন্ধ হবার শব্দ হল। ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে ভয়ে। শরীর বেয়ে

জলের ফোঁটাগুলো নামতে থাকে। নিজেকে মুছে নিয়ে সে বেরিয়ে আসে। শোবার ঘরে ঢোকে। সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। যত সব অর্থহীন কঙ্গনা। অফিস যাবার জন্য দ্রুত তৈরি হতে গিয়ে আলমারি খুলে দেখে ওর সমস্ত অন্তর্বাসগুলোকে কেউ ওলোটপালট করে দেখেছে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে ওঠে সে। লোকটা ওর ব্রা আর প্যান্টিগুলো কি নিজের শরীরে ঘষেছে? ফ্যানটাসিতে অ্যাশলেকে ধর্ষণ করতে চেয়েছে? পুলিশকেও তো জানানো যাবে না। পুলিশ হাসবে– আপনার ব্রা প্যান্টি কেউ ঘাঁটাঘাটি করেছে তার তদন্ত করতে হবে? আপনি তাকে দেখেছেন? কে আপনাকে অনুসরণ করে আপনি তাকে দেখেছেন?–

অ্যাশলে পোশাক পরতে পরতে ভাবে দ্রুত তাকে এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু পরেই মনে পড়ল–আমি কোথায় থাকি সে জানে। কখন কোথায় যাই, কি করি সবই তার জানা। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানি না। একবার একটা বন্দুক রাখার কথা ভেবেছিল। হিংসা পছন্দ করে না বলে রাখেনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা রাখা জরুরি।

নিচে এসে দেখে চিঠির বাক্সে একটা খাম রয়েছে। বেডফোর্ড এরিয়া হাইস্কুলের পাঠানো। খাম ছিঁড়ে দেখে একটা নিমন্ত্রণ পত্র।

দশ বছরের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। দশটা বছর কেটে গেল। তোমার কি জানতে ইচ্ছে করে না, তোমার একসময়ের পুরনো বন্ধুরা, সহপাঠীরা, সবাই এখন কেমন কিভাবে আছে? গত দশ বছর তারা কীভাবে কাটিয়েছে? তাই এক পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের

আয়োজন করেছি। মজা, হাসি, গান, আড্ডা, খাওয়া দাওয়া। তোমার দেখা পাবার জন্য পুরনো বন্ধুরা উদগ্রীব হয়ে, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।–

অফিসের পথে যেতে যেতে অ্যাশলের মনে পড়ল চিঠিটার কথা। জিম ক্লেয়ারি যে তার দেখা পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে নেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। সিনেমার ফ্লাশব্যাকের মত তার চোখে ভেসে ওঠে,–আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, আমার কাকা শিকাগোয় একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে...ভোরবেলার ট্রেনে যাব...তুমি কি যাবে? আমি তোমার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করব।–

অ্যাশলে বুঝতে চেষ্টা করে একা একা স্টেশনে অপেক্ষা করা...কেউ আসে না। সেই হতশা ও তীব্র অপমান, প্রতারিত হওয়া। জিম মত বদল করেছিল কিন্তু জানায়নি এবং শেষ রাতের ফাঁকা স্টেশনে অ্যাশলেকে ছেড়ে দিয়েছিল। অ্যাশলে ভাবে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে যাবে না সে।

কাছের একটা রেস্তোরাঁয় শেন মিলারের সঙ্গে দুপুরের খাওয়া সারতে গিয়েছিল অ্যাশলে। নিঃশব্দে দুজনে খাচ্ছিল। মিলার জিজ্ঞেস করে,–কি এত ভাবছ?– মিলারকে অন্তর্বাসের ব্যাপারটা বলতে গিয়েও বলে না কারণ কোন প্রমাণ নেই। তাছাড়া বন্ধ ঘরে কেউ ঢুকবেই বা কীভাবে?স্কুলের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের কথা বলে। যাচ্ছে না তাও বলে।মিলার বলে,–গেলে ভাল করতে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে বেশ মজা আনন্দ হয়। পুরনো বন্ধুরা আসে তো।– পুরনো বন্ধুদের মধ্যে জিম ক্লেয়ারি কি আসবে? স্ত্রী বাচ্চাদের নিয়ে অ্যাশলেকে কি বলবে আমি দুঃখিত স্টেশনে আসতে পারিনি বলে! না–অ্যাশলে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে যাবে না।

তবুও অ্যাশলের মনে হয়, অনেক পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে ভালই লাগবে। যেমন ফ্লোরেন্স শিয়েফার। হঠাৎ স্কুল এমন কি শহর ছেড়ে চলেই বা গিয়েছিল কেন? মিলারকে জানায় সে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে যাবে। ১৫ই জুন শনিবার অনুষ্ঠান। সে শুক্রবার যাবে। রবিবার সন্ধ্যেয় ফিরে এসে সোমবার অফিসে আসবে। মিলার সম্মতি দেয়।

অফিসে এসে নিজের কমপিউটার চালু করে আঁতকে ওঠে অ্যাশলে। পর্দায় ওর একটা নগ্ন প্রতিমূর্তি ফুটে ওঠে। তারপর কিছু কিছু বিন্দু একটা হাত তৈরি করে। হাতে একটা ছুরি। ছুরিসহ হাতটা অ্যাশলের বুকে বিধে যায়। সারা পর্দা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে রক্ত। অ্যাশলে তীব্র চিৎকার করে ওঠে। কমপিউটারটা বন্ধ করে দেয় সে। ওর চিৎকারে সবাই ছুটে আসে। শেন মিলার উদ্বিগ্নভাবে জানতে চায়কী হয়েছে? অ্যাশলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কমপিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু সামলে কমপিউটারটা চালু করে। দেখে পর্দায় সবুজ বাগানে সাদা খরগোেস ছুটে বেড়াচ্ছে। সবার চোখে তীব্র সন্দেহ। ওকে দেখতে থাকে অবাক হয়ে। অ্যাশলে চেয়ারে বসে পড়ে।

শেন মিলার ওর পিঠে হাত রাখে। অ্যাশলে অসহায়, মুখ তুলে তাকায়। মিলারও সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ বিষণ্ণ গলায় বলে,–ওটা ছিল–এখন চলে গেছে।– সবাই কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ফিরে গেল। মিলার বলে,–তুমি ডাঃ স্পিকম্যানকে দেখাচ্ছ। না কেন?– অ্যাশলে ভাবে তার কি সত্যিই মনোরোগ বিশেষজ্ঞর দরকার?

ডাঃ বেন স্পিকম্যান। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স। অ্যাশলে তাকে বলে,–গতরাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। বিশ্রী রঙের

কতকগুলো ফুল আমায় কি যেন বলছিল–আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি দৌড়ে পালাচ্ছিলাম...কেন-তা জানি না।–

ডাঃ স্পিকম্যান ওকে নিরীক্ষণ করেন। তারপর বলেন–আপনি কি কোন কিছুর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?–

–জানি না, তবে কেউ আমায় অনুসরণ করে সবসময়। সে আমাকে খুন করতে যায়।

–আপনি তো একা থাকেন?

–হ্যাঁ।

–আপনি কি কাউকে ভালবাসেন?

–না।–

ডাঃ স্পিকম্যান একটু ভেবে বলেন,–এ তো একটা গভীর মানসিক সমস্যা। এই বয়সের একক মহিলারা মনের চাহিদা থেকে একজন পুরুষের প্রয়োজন অনুভব করেন। তাই থেকে ফিজিক্যাল টেনশন গড়ে ওঠে।–

অ্যাশলের প্রয়োজন তবে গুড ফাঁক? কথাটা মনে হতেই হাসি পায় তার। তার বাবা বলেন,–এই শব্দটা কখনও উচ্চারণ কোর না। এসব নোংরা খারাপ মেয়েদের কথা। এসব ভাষা শিখলে কোথায়?– ডাঃ স্পিকম্যান বলেন, আপনার কোন গুরুতর মানসিক

সমস্যা নেই। খুব বেশি পরিশ্রম ও উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা থেকেই এমন হচ্ছে। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।–

পরের সপ্তাহটা পুনর্মিলন উৎসবে যাবে কি যাবে না, এই টানা পোড়েনে কাটল। শেষ অবধি মনকে শান্ত করে ঠিক করে যাবে। অতীত হল মূল্যহীন। অতীতে যাই ঘটে থাক, ভুলে যাবে।

পরদিন বিমান বন্দরের কাউন্টার থেকে নিজের বিমান টিকিটটা সংগ্রহ করে দেখে, সেটি প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু সে সাধারণ টিকিট বুক করেছিল। কর্মীকে সে বলে, একটা ভুল হয়েছে আমর টিকিট ছিল সাধারণ শ্রেণীর। কিন্তু এটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাউন্টারের কর্মীটি কমপিউটারের বোতাম টিপে পর্দায় চোখ রেখে বলে,–এখানে সাধারণ শ্রেণীর টিকিট কাটলেও পরে ফোনে আপনি তা প্রথম শ্রেণীর টিকিটে পরিবর্তন করেন।– লোকটা একটা রসিদে অ্যাশলের ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দেখায়। অ্যাশলে কোনও মতে হ্যাঁ বলে। টিকিট হাতে নিয়ে ও অনুভব করে ওর সারা শরীরে ঠান্ডা স্রোত বইছে। ও কখনই ফোন করে টিকিটের শ্রেণী পরিবর্তন করেনি।

বেডফোর্ড পৌঁছে এয়াপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া নিল। বহুবছর আগে রাগে দুঃখে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া শহরটাকে ঘুরে দেখতে থাকে। যদিও তত ছোট নেই। টেলিভিশন চ্যানেল, আর্ট গ্যালারি, দৈনিক খবরের কাগজের অফিস হয়েছে। প্রচুর রেস্তোরাঁও হয়েছে। পুরনো শহরটাকে দেখতে দেখতে ছোট বেলার মা-বাবার ঝগড়াগুলো ওর কানে বাজতে থাকে। ঝগড়ার কারণগুলো অবশ্য ওর মনে নেই।

পাঁচটা নাগাদ হোটেলে ফিরে স্নান সেরে পুনর্মিলন উৎসবে যাবার জন্য তৈরি হতে থাকে। সন্ধ্যে সাতটায় সে সুন্দরভাবে সাজানো স্কুল বাড়ির জিমন্যাসিয়াম ঘরে ঢোকে। তার পুরনো সহপাঠীদের অনেককেই চেনার উপায় নেই। শদুয়েক ছাত্রছাত্রী হাজির হয়েছে। অ্যাশলে জিম ক্রিয়েরিকে খুঁজছিল। ওর কতখানি পরিবর্তন হয়েছে কে জানে। ওর সঙ্গে ওর স্ত্রী আর বাচ্চারাও কিন্তু থাকবে। অনেকেই ওর দিকে এগিয়ে আসছে। –হালো, আমি ট্রেন্ট ওয়াটারগন, তোমায় দুর্দান্ত দেখাচ্ছে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।– আর একজন এগিয়ে আসে,–হ্যালো, অ্যাশলে, আমি আরট ডেভিডস।– আর একজন এগিয়ে এল আমি লেমি হল্যান্ড। অ্যাশলে ক্রমশ বিস্ময়াবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। দশ বারো বছরে সবাই এত বদলে গেছে? কিন্তু জিম ক্লেয়ারি কোথায়? হয়ত অ্যাশলের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে আসেনি।

একজন সুন্দরী অ্যাশলের সামনে এসে বলে–হাই অ্যাশলে, ফ্লোরেন্স শিয়েফারকে মনে পড়ে? অ্যাশলে উচ্ছ্বসিত হয়। তার সবচেয়ে ঘনিষ্ট ও প্রিয় বান্ধবী ছিল ফ্লোরেন্স। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। ফ্লোরেন্স জানতে চায়,–হঠাৎ কোথায় চলে গিয়েছিলে অ্যাশলে?—

আমার বাবা আমায় লন্ডনের কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল।– ফ্লোরেন্স বলে,–পুলিশের গোয়েন্দারা আমার কাছে তোমার খোঁজ জানবার চেষ্টা করেছিল। ওরা জানত জিম তোমার সঙ্গেই গিয়েছিল।– অ্যাশলে জানতে চায়, কেন খোঁজ করছিল পুলিশ ফ্লোরেন্স বলে,–খুনের তদন্তটার জন্য।–

অ্যাশলে ফ্যাকাসে মুখে বলে–কে খুন হয়েছিল?– ফ্লোরেন্স বিস্মিত হয়,–তুমি জান না? জিম গ্র্যাজুয়েশন পার্টির পরের দিনই নৃশংসভাবে ছুরির আঘাতে খুন হয়।– অ্যাশলের

মাথা ঘুরতে থাকে। কোন রকমে টেবিলের একটা কোণ ধরে নিজেকে সামলায়। ফ্লোরেন্স বলে,–দুঃখিত অ্যাশলে। আমার খেয়াল ছিল না তুমি লন্ডন চলে গিয়েছিলে। আমি ভাবছিলাম খবরের কাগজে তুমি ঘটনাটা পড়েছ।–

অ্যাশলে ভাবে এতগুলো বছর সে জিমকে অপরাধী ভেবে এসেছে। ঘৃণা করেছে। কিন্তু জিমকে কে খুন করল? অ্যাশলে জানে তার বাবাই এ কাজ করেছে। ফ্লোরেন্সকে বলে,– আমার শরীর ভাল লাগছে না। আমায় একটু একা থাকতে দেবে?– ফ্লোরেন্স বলে,– নিশ্চয়ই।– বলে সরে যায়।

পরদিন সকলেই ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে এল সে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল সে চিৎকার করে গলাগালি দিয়ে চলেছে। ক্ষতবিক্ষত জিম আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবার আততায়ীর মুখটা স্পষ্ট হয়। হাতের ছুরি থেকে রক্ত পড়ছে। তার বাবা। তার বাবাই আততায়ী।

.

০৫.

পরের মাসগুলো দুঃস্বপ্নের মত কাটল অ্যাশলের। সব চোখের সামনে ভাসতে লাগল। জিমের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। একবার ভাবল ডাঃ স্পিকম্যানের কাছে যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কী করে তার সঙ্গে আলোচনা করবে? বাবা এ কাজ করেছে এটা ভাবতেই সে অপরাধবোধে ভুগছিল। অথচ সে নিশ্চিত জানে তার বাবাই এ কাজ করেছে। চিন্তাটা মন থেকে সরাবার জন্য কমপিউটারের মধ্যে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু পারে

না। শেন মিলার এগিয়ে আসে–অ্যাশলে, তুমি ঠিক আছ তো? আজ রাতে বাইরে কোথাও খেতে যাবে?–না, আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত আমি একটু ব্যস্ত থাকব। অন্য কোন দিন যাব, কেমন?–ও. কে, কোন দরকার থাকলে বোল।–হা।– মিলার চলে যায়।

শুক্রবার বিকেলে অফিস ছুটির পর ডেনিস টিব্বলে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে,–আমি তোমার সাহায্য চাই।–দুঃখিত ডেনিস।–আরে, একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাই। আমি একজনের প্রেমে পড়েছি। তাকে বিয়ে করতে চাই। এ ব্যাপারে একজন মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমার পরামর্শ চাই।–

অ্যাশলে ভাবে যদি তাই হয় তবে অ্যাশলের পক্ষে তা ভালই হবে। ডেনিস আর ফেউয়ের মতে তার পেছনে লেগে থাকবে না। তবে তার ফ্ল্যাটে ডেনিসকে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। কোন অভদ্রতা করলে ওকে তো আর ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিতে পারবে না। বরং ডেনিসের ফ্ল্যাটে নিজে গেলে ইচ্ছেমত বার হয়ে আসতে পারবে।

ডেনিসের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে অ্যাশলে চমকে যায়। যেন কোন ভয়ের সিনেমার সেটে ঢুকে পড়েছে সে। দেওয়াল ভর্তি করে হরর মুভির গা ছমছমে পোস্টার। অন্যদিকে নগ্ন নারীদেহের পোস্টারও রয়েছে। টিভির ওপর, টেবিলে, বুক শেলফে, কাঠের তৈরি মূর্তি। যেন কোন দেহপসারিণীর ঘর। এখান থেকে কতক্ষণে বের হতে পারবে ভাবতে থাকে অ্যাশলে। ডেনিসকে বলে,–সেই মেয়েটির কথা তাড়াতাড়ি বল। আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।– ডেনিস সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে সে সিগারেট নেবে কিনা। অ্যাশলে বলে সে সিগরেট, মদ খায় না।

ডেনিস বলে,–তুমি তো আশ্চর্য মেয়ে।– গ্লাসে একপাত্র রেড ওয়াইন ঢেলে অ্যাশলেকে দেয়। বলে–এতে তোমার জাত যাবে না।– অ্যাশলে হালকা চুমুক দিয়ে বলে,–এবার তোমার প্রিয়তমার বিষয়ে বলো।– ডেনিস বলে,–এমন মেয়ের দেখা আর পাব কিনা জানি না। তোমারই মত যৌন আবেদনময়ী।– অ্যাশলে রেগে যায়। ডেনিস বলে,–রাগ করছ কেন? প্রশংসা করেই আমি কথাটা বললাম।– অ্যাশলে আবার পানীয়তে চুমুক দেয়, আর একটা অস্বস্তি বোধ করে শরীরে। এক আচ্ছন্নতা গ্রাস করে তাকে। ডেনিস বলে চলেছে,–মেয়েটি আমাকে চাইলেও তার মা, বাবার মত নেই। তাই আমাকে বিয়ে করতে হলে...– অ্যাশলে এক গভীর ক্লান্তিতে তলিয়ে যেতে থাকে।

ধীরে ধীরে জেগে উঠে। অ্যাশলের যেটা প্রথম মনে হল সেটা হল কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে। মাদক জাতীয় কিছু তার পানীয়ে মেশানো হয়েছিল। তার প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। চোখ খুলে রাখতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তবুও ধীরে ধীরে চোখ খুলে ঘরের চারপাশে তাকাতেই এক তীব্র আতঙ্কে ডুবে যায় সে। কোন এক হোটেলের ঘরে সে শুয়ে আছে। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। বিছানার পাশে রাখা হোটেলের রুম সার্ভিস মেনুতে চোখ পড়ে-দ্য শিকাগো শপ হোটেল। শিকাগোতে সে কীভাবে পৌঁছল? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। বিছানার পাশে রাখা টেলিফোন তুলে সে জিজ্ঞেস করে,–আজ কী বার?– বিস্ময় মাখানো গলায় উত্তর আসে,–আজ সোমবার।– অ্যাশলে ফোন রেখে দেয়। তার মানে মাঝখানে দুটো গোটা রাত এবং দিন কেটে গেছে। ডেনিসের ফ্ল্যাটে মাদক মেশানো রেড ওয়াইনে চুমুক দেওয়ার পর থেকে তার মন সম্পূর্ণ ফাঁকা। মাদকের নাম ডেট রেপ ড্রাগ। সে বোকার মত ডেনিসের কথা বিশ্বাস করে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে পানীয়তে চুমুক দিয়েছিল। ঐ ড্রাগ মেশানো পানীয় তার স্মৃতি থেকে দুদিনের সব ঘটনা মুছে দিয়েছে। এখান থেকে দ্রুত বের হতে হবে। নিজেকে খুব অপরিচ্ছন্ন মনে হল।

শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়ায় সে। ভাল করে স্নান করে। তবে যদি সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এই চিন্তাটাই ওকে ভাবিয়ে তোলে। শাওয়ার বন্ধ করে বাইরের আসে। ঘরে এসে নিজের পোশাকগুলো কোথাও খুঁজে পায় না। এখান থেকে বেরোতে তো হবে। তাই হোটেলের আলমারি থেকে একটা কালো চামড়ার মিনিস্কার্ট আর ভোলা টিউব টপ পরে। ঐ একটাই পোশাক ছিল আলমারিতে। সে আয়নায় নিজেকে দেখে। কলগার্লের মত দেখাচ্ছে তাকে। হাতব্যাগে চল্লিশ ডলারের মত পড়ে আছে। চেকবই আর ক্রেডিট কার্ড দুটো রয়েছে। একতলায় রিসেপশনে আসে।

রিসেপশনের কর্মীটি হেসে বলে,–এরই মধ্যে চলে যাবে? সময়টা নিশ্চয়ই ভালই কেটেছে?– অ্যাশলে বুঝতে চেষ্টা করে কী উদ্দেশ্যে লোকটা কথাগুলো বলছে। পাঞ্চ মেশিনে বার কতক ক্রেডিট কার্ডটা ঘষে নিয়ে কর্মীটি বলে,–দুঃখিত। এটা কাজ করছে না। আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা নেই।–মানে,– অ্যাশলে আকাশ থেকে পড়ে।

–আপনারা চেক নেন?–না।– খুব অসহায় লাগে নিজেকে। সে একটা ফোন করতে চায়। লোকটা ঘরের কোণে ফোনটা দেখিয়ে দেয়। সানফ্রানসিকো মেমোরিয়াল হাসপাতালে তার বাবার অফিসে ফোন করে সে। কিন্তু তার বাবা উটিতে। অ্যাশলে জানতে চায়, কতক্ষণ লাগবে অপারেশন শেষ হতে? কর্মীটি বলে সে বলতে পারবে না। অ্যাশলে বলে বাবাকে বলতে একটু ফাঁক পেলেই যেন অ্যাশলেকে ফোন করে। ফোনের দিকে তাকিয়ে নম্বরটা বাবার রিসেপশনিস্টকে দিয়ে দেয়। আবার বলে খুব জরুরি দরকার। বাবা যেন অবশ্যই ফোন করেন।

সোফায় বসে অপেক্ষা করতে করতে সে লক্ষ্য করে যারা যাতায়াত করছে তারা তির্যক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে কুপ্রস্তাবও দিচ্ছিল। এই পোশাকে বসে থাকতে ওরও অস্বস্তি হচ্ছিল। আধঘন্টা পার ফোনটা বেজে ওঠে। অ্যাশলে প্রায় দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরে। বলে,–বাবা, আমি শিকাগোতে রয়েছি। আমার একটা বিমান টিকিট আর ক্যাশ টাকা দরকার।–

বাবা বিস্মিত হন–শিকাগোতে কেন গেছ?–ফোনে এক্ষুনি সব বলতে পারছি না।–

ডাঃ প্যাটারসন বলেন–১০.৪০ মিনিটে একটা বিমান আছে সান জোসে ফেরত আসবার। তোমার নামে ঐ বিমানে টিকিট সংরক্ষণ করে দিচ্ছি। ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের মানি ট্রান্সফার বিভাগে ফোন করে বলে দিচ্ছি, তোমার ঠিকানায় ওদের এজেন্ট আধঘন্টার মধ্যে ডলার পৌঁছে দেবে। তোমার ঠিকানা দাও। ফিরে আমার অফিসে চলে এসো।–.

–না, বাবা, আমার একটু নিজের অ্যাপার্টমেন্টে দরকার আছে।– অ্যাশলে এই কথা বলল কারণ এই পোশাকে বাবার সামনে কী করে যাবে?

বিমানে বসে অ্যাশলে ভাবতে থাকে ডেনিস টিব্বলে ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তার শাস্তি ওকে পেতেই হবে। এ অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। পুলিশে খবর দিতে হবে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সে অন্য পোশাক পরতে আলমারির দিকে যায়। তখনই দেখতে পায় ড্রেসিং টেবিলে একটা আধপোড়া সিগারেট পড়ে রয়েছে। আতঙ্কে শিহরিত হয়ে পড়ে সে।

দ্য ওক রেস্তোরাঁয় কোণের টেবিলে ডাঃ প্যাটারসন আর অ্যাশলে মুখোমুখি বসেছিল। তিনি অ্যাশলেকে নিরীক্ষণ করছিলেন,–তোমার চেহারাটা এরকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? শিকাগোতে কেন গিয়েছিলে?—

আমি জানি না।–মানে?– বাবাকে সব কথা বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারে অ্যাশলে–শেষে ঠিক করে বাবাকে সব বলাই ভালো। কারণ কি করা উচিত তার সঠিক পরামর্শ বাবাই দিতে পারবে। সে বলে,–ডেনিস টিব্বলে একটা সমস্যায় পড়ে তার সমাধানের জন্য আমাকে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিল।–

ডেনিস টিব্বলে–মানে সেই সাপের মত লোকটা?– কয়েক মাসে আগে তার সহকর্মীদের সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়েছিল। তাই বাবা ওদের চেনে।

–ওর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?– অ্যাশলে বোঝে বাবাকে বলা তার উচিত হয়নি। বাবা তার সব ব্যাপারেই বড় বাড়াবাড়ি করে। বিশেষ করে পুরুষ কেউ হলে। অ্যাশলে বলে,–না ওর সঙ্গে সহকর্মীর বাইরে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। ও আমাকে একপাত্র রেড ওয়াইন খেতে দেয়। এরপর অ্যাশলে ইতস্তত করতে থাকে, কীভাবে এর পরের ঘটনা বলবে? বাবার মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে। হঠাই ওর মনে ভেসে ওঠে বাবার কথা আবার যদি আমি আমার মেয়ের আশেপাশে তোমায় দেখি আস্ত রাখব না। এরপর জিম ক্লেয়ারির কী পরিণতি হয়েছিল তা অ্যাশলের মনে পড়ে। তাই পুরো ঘটনাটা না বলে রেখে ঢেকে ছোট করে বলবে ভাবে। কিন্তু অ্যাশলের চোখে চোখ রেখে দৃঢ় গলায় প্যাটারসন বলেন,–আমি পুরো ঘটনাটা হুবহু শুনতে চাই।–

বিছানায় শুয়ে সেই রাতে অ্যাশলে ছটফট করছিল। ডেনিস যা করেছে তা সবাই জানতে পারলে তার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক হবে। ডেনিস যে ওর সম্পর্কে আগ্রহী তা অ্যাশলেকে আগেই অনেকে বলেছে। তাও ওর ফ্ল্যাটে যাওয়াটা অ্যাশলের উচিত হয়নি। প্রায় রোজই তার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে অ্যাশলে। এখন অ্যাশলে নিশ্চিতভাবেই জানে ওর অনুসরণকারী ছিল ডেনিস টিব্বলেই।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় অ্যাশলে অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তখন ফোন বেজে উঠল। শেন মিলার বলল,–অ্যাশলে খবরটা শুনেছ–ডেনস টিব্বলে মারা গেছে। টেলিভিশনে দেখাচ্ছে। আততায়ী কাল রাতে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে ওকে খুন করেছে।–

খবরটা শুনে হাত পা অবশ হয়ে আসে অ্যাশলের।

.

০৬.

ডেপুটি শেরিফ স্যাম ব্লেক সানেভিলে অ্যাভিনিউতে ডেনিস টিব্বলের ফ্ল্যাটে ঢুকে জানতে চাইলেন,–লাশ কোথায়?– একজন পুলিশকর্মী বলে,–শোবার ঘরে স্যার।– শোবার ঘরের দরজায় থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সারা শরীরটা কাঁচের বোতল দিয়ে কোপানো হয়েছে। পুরুষাঙ্গটিকেও থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। নগ্ন লাশটার সারা দেহে কাঁচের টুকরো গেঁথে রয়েছে। খুব নৃশংসভাবে খুন করেছে খুনি।

ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার এসে হাজির হয়েছে। ডেপুটি শেরিফ তাকে জিজ্ঞেস করলেন–মৃত ব্যক্তির নাম কী?–

–ডেনিস টিব্বলে স্যার। তিন বছর এই বাড়িতে আছেন।–,–ওনার সম্বন্ধে কিছু জানেন আপনি?–ভদ্রলোক অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না। পেশাদার বারাঙ্গ না মেয়েদের মাঝে মধ্যেই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতেন। চাকরি করতেন গ্লোবাল কমপিউটার গ্রাফিক্স করপোরেশনে।– ব্লেক জিজ্ঞেস করল,–লাশটা কে প্রথম দেখে?–মারিয়া এই ফ্ল্যাটে কাজ করে। কাল ওর ছুটি থাকায় কাজে আসেনি। আজ এসে ওই প্রথম লাশটিকে দেখতে পায়।–

ডেপুটি শেরিফ মারিয়াকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। মধ্য চল্লিশের ফর্সা কালো চুলের ব্রাজিলিয় মহিলা মারিয়া। উদ্বেগ এবং আতঙ্কে কাতর। নার্ভাস ভঙ্গিতে ডেপুটি শেরিফের সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে,–আমি সকাল সতাটায় এসে দেখি সদর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা নয়। আমি অবাক হই। ভেতরে ঢুকে দেখি সব আলোগুলো জ্বলছে। শোবার ঘরে ঢুকে দেখি এই দৃশ্য।–

–মারিয়া তুমি কি এই ঘর থেকে কিছু সরিয়েছ?–মানে?–ভয় পেওনা-সাহেবের লাশ দেখার পরে এঘরের কোন কিছুতে তুমি হাত দিয়েছিলে?–

মারিয়া বলে,–মেঝেতে দুটো ভাঙা মদের বোতল পড়েছিল, আমি সেগুলো পরিষ্কার করে দিই। না হলে কারও পায়ে ফুটবে।– হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করেন,–সেগুলো তুমি কী করেছ?—

রান্নাঘরের জঞ্জাল ফেলার ব্যাগে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু রান্নাঘরের সেই ব্যাগে পাওয়া গেল না মদের বোতলের ভাঙা অংশ। জঞ্জাল ফেলার পাত্রে বোধহয় কেউ ফেলে দিয়েছে। তবে একটা পোড়া সিগারেটের অংশ চোখে পড়ল। সেটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে নিলেন। মারিয়ার কাছে জানতে চাইলেন কিছু খোয়া গেছে কিনা। মারিয়া পর্যবেক্ষণ করে বলল,– না, বোধহয়।– তার মানে ডাকাতি করা এই খুনের উদ্দেশ্য নয়।

ডেপুটি শেরিফ ও শেরিফ ম্যাট ডাও লিং তার অফিসে বসেছিলেন। তদন্তের অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন শেরিফ।

ডেপুটি শেরিফ বললেন–ভাঙা মদের বোতলগুলো পাইনি।– পোড়া সিগারেটের টুকরো পেয়েছি। সিগারেটে লিপস্টিকের দাগ পেয়েছি। অর্থাৎ কোন মহিলা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারিনি। খুনের আগে ডেনিস যৌনমিলন করেছিল। বিছানায় চাদরে দাগ। নারীর যৌনকেশ একথাই প্রমাণ করে। আমি সেগুলোর ডি. এন. এ. টেস্ট-এর ব্যবস্থা করেছি।–

শেরিফ বলেন–তাড়াতাড়ি কেসটার সমাধান করো। মিডিয়া যাতে মাতামাতি করতে না পারে। খবরের কাগজ যেন শিরোনাম লিখতে না পারে–সিলিকন ভ্যালিতে সেক্স ম্যানিয়াকের আক্রমণ।– ব্লেক বলে,–আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।–

অ্যাশলে মানসিকভাবে নিজেকে এতটাই বিধ্বস্ত ভাবছিল যে অফিসে যাবে কি যাবে না স্থির করতেই কিছুটা সময় চলে গেল। যে কেউ তার দিকে তাকালেই বুঝবে কিছু একটা ঘটেছে তা সে বুঝতে পারছে। পুলিশ অফিসে এলে তো তাকেও জেরা করবে।

সত্যি কথাটা বললে তো খুনি হিসেবে তাকে সন্দেহ করবে। নয়তো তার বাবাকে। জিম ক্লেয়ারির খুনের ঘটনাটা মনে পড়ে তার।

স্যাম ব্লেক মানে ডেপুটি শেরিফ গ্লোবালের অফিসে যখন এলেন কর্মচারীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চাপা গলায় আলোচনা চালাচ্ছে। শেন মিলার এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায়। ডেপুটি শেরিফ জানতে চান,–কেমন কর্মী ছিলেন টিব্বলে?–

–সৎ কর্মী। কমপিউটার জিনিয়াস ছিল সে।–

ওর সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?–না—জুয়া খেলত কি?–জানি না?–মহিলা বান্ধবী ছিল কি?–মহিলারা ওর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করত বলে শুনিনি। ডেনিস চাষা স্বভাবের মানুষ ছিল। তবে শুনছিলাম একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে।–

–আপনার অন্য কর্মীদের সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।–নিশ্চয়ই।– শেন মিলার ওকে বড় হলঘরে নিয়ে আসে। ডেপুটি শেরিফ বলতে থাকেন–আপনাদের সহকর্মী ডেনিস টিব্বলের খুনের ব্যাপার আপনারা নিশ্চয় জানেন। ঐ বিষয়ে কিছু জানা থাকলে আমাকে জানিয়ে তদন্তের কাজে সাহায্য করতে পারেন। তার কি কোন শত্রু ছিল?–

সারা ঘরে নৈঃশব্দ্য ছড়িয়ে পড়ে। তিনি কোন এক মহিলাকে বিয়ে করতে চলেছিলেন। কেউ তাকে চেনেন?– এই প্রশ্নে অ্যাশলের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। এখন পুলিশ কর্তা তাকে দেখলে সন্দেহ করবেনই। ওর মনে ভেসে ওঠে ডেনিসের কৃত কুকর্মের কথা শুনে ওর বাবার মুখটা কেমন জ্বর, অমানবিক, নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিল। নিজেই নিজের

মনকে প্রবোধ দিতে শুরু করে, ওর বাবা কাউকে খুন করতে পারেন না। তিনি একজন শল্য চিকিৎসক। জিম ক্লেয়ারি, ডেনিস টিব্বলেকে যেভাবে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে তা শল্য চিকিৎসার ভঙ্গিতেই। –তা হলে ধরে নেব শুক্রবার অফিস ছুটির পর থেকে ডেনিস টিব্বলে সম্পর্কে আপনারা আর কিছু জানেন না?– টোনি প্রেসকট এক কোণ থেকে অ্যাশলেকে লক্ষ্য করতে থাকে। মনে মনে বলে শুক্রবার সন্ধ্যেয় যে ডেনিসের সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলে তা বলছ না কেন? স্যাম ব্লেক কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলেন,–মিলারের কাছে আমার ফোন নম্বর রয়েছে। আপনাদের কিছু মনে পড়লে আমায় ফোন করে জানাতে পারেন।– বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল–এই অফিসে কারও সঙ্গে কি ডেনিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল?– মিলার বলে,–শুধু আমাদের একজন কমপিউটার কর্মীর সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব ছিল।–

আমি কি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি?–অবশ্যই।– মিলার এবং ব্লেককে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে অ্যাশলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মিলার পরিচয় করিয়ে দেয়। অ্যাশলে জোর করে হাসার চেষ্টা করে। ওর মন বলে সাবধান বেস কিছু বলে ফেলো না।

–ডেনিস টিব্বলে আপনাকে বিশেষ পছন্দ করতেন?–আমি ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতাম ।– আপনারা একসাথে বেরিয়েছেন? ডেটিং করেছন?–না, আমি ব্যাপারটাকে পাত্তা দিতাম না।–

ডেনিস কি আপনাকে ওঁর বিয়ের কথা কিছু বলেছিলেন?– অ্যাশলে সতর্ক হয়। এমনও তো হতে পারে, অ্যাশলের ডেনিসের ফ্ল্যাটে যাওয়া প্রমাণ হয়ে গেছে আঙ্গুলের ছাপ বা

জুতোর দাগ থেকে। তাকে এখন বাজিয়ে দেখছেন পুলিশ কর্তা। –মিস প্যাটারসন,– ডাক শুনে সম্বিৎ ফিরে আসে অ্যাশলের। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,–এত গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়ে গেছে ঘটনাটা যে আমি...–ঠিক আছে, ঠিক আছে–ব্লেক আবার দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করে। যদি ওর আঙুলের ছাপ পেয়ে থাকে এরা? তাই বলে,–হ্যাঁ। একবার ডেনিসের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম একটা দরকারি কাগজ আনতে।–কতদিন আগে?– সপ্তাহ খানেক হবে হয়তো?—

পুলিশ কর্তা ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন অ্যাশলের কথায় কোন ফাঁক রয়েছে। নাকি–কতটা মিথ্যে বলছে সে। অ্যাশলে ভাবে সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই উচিত ছিল। বাবা হয়তো অপরাধী নন। হয়তো কোন চোর ঢুকেছিল। দশ বছর আগেও যেমন জিম ক্লেয়ারিকে খুন হতে হয়েছিল। তাও কাকতালীয় বলে ধরে নিলেও বড় বেশি অবিশ্বাস্য। বাবা কেন এ কাজ করল?

ডেপুটি শেরিফ বলছেন,–এটা একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। কিন্তু কোনো মোটিভ নেই। মাদক, ডাকাতি, নারীঘটিত কোন ব্যাপার নেই। কী কারণে খুন হল ডেনিস?– শেন মিলার বলে,–আমিও তাই ভাবছি। খুনের মত অপরাধ মোটিভ ছাড়া কেন ঘটবে?– ডেপুটি শেরিফ অ্যাশলের দিকে তাকান। অ্যাশলে ঐ চোখের ভাষা পড়তে পারে–আমি আপনার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি।– পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে অ্যাশলেকে দেন। –যদি কোন কথা আমায় জানাতে চান ফোন করে জানাতে পারেন।– নিশ্চয়ই।– ডেপুটি শেরিফ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে নিশ্চিন্ত হয় অ্যাশলে।

সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে ফোনে অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড করা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল–গত রাতে তুমি আমায় যে গরম করা স্বাদ দিয়েছিলে আজ রাতেও ঐ স্বর্গের স্বাদ আমি পেতে চাই। একই সময়, একই জায়গায় দেখা হবে।– ওর সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। ও পাগল হয়ে যাবে। বাবা নয়। কোন পাগল কি এর সঙ্গে যুক্ত?

ঐ ঘটনার পাঁচ দিন পরে অ্যাশলে তার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানির থেকে একটা স্টেটমেন্ট পেল। বিল নম্বর ৪৪–আধুনিক পোশাকের বিল ৪৫০ ডলার। বিল নম্বর ১০৩–সার্কাস ক্লাবের ডিনার ৩০০ ডলার, বিল নম্বর ১৭৯-লুইস রেস্তোরাঁ ২৫০ ডলার। অ্যাশলে কোনদিন ঐ পোশাকের দোকানের নাম শোনেনি। ঐ ক্লাব বা রেস্তোরাঁয়ও যায়নি।

.

০৭.

ডেনিস টিব্বলের হত্যা রহস্যের তদন্তের বিবরণ অ্যাশলে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল । এবং টেলিভিশনে দেখছিল। পুলিশ কোন কুল কিনারা পাচ্ছে না। ব্যাপারটা শেষ ভেবে অ্যাশলে নিশ্চিন্ত হল। হঠাই তখন এক সন্ধ্যেয় ডেপুটি শেরিফ অ্যান ব্লেক তার বাড়িতে এসে হাজির। বলল,–এদিক দিয়েই একটা কাজ সেরে যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।– অ্যাশলে সৌজন্যবশত তাকে আপ্যায়ন করে। ভেতরে ঢুকে ব্লেক বলে,–আপনার ফ্ল্যাটটা তো সুন্দর করে সাজানো, তবে ডেনিসের পছন্দ হত না?–

বলতে পারি না। কারণ সে আমার ফ্ল্যাটে আসেনি কখনও।– ব্লেক বলে,–ডেনিসের খুনটা খুব অদ্ভুত। কোন মোটিভ ছাড়া খুন তো। তবে গ্লোবালের অফিসের সবাই বলছে আপনার সঙ্গেই যেটুকু মেশার মিশতেন ডেনিস। তাই আপনি যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন এই খুনের ব্যাপারে অবশ্যই করবেন। আসলে খুন হওয়া কেসের সামাধান না করতে পারলে আমার বড় হতাশা লাগে। মনে হয় একজন অপরাধী আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। যাক আজ চলি।– অ্যাশলে শীতল চোখে তার চলে যাওয়া দেখতে থাকে। ওর এই আসার কারণ কী? আমার জন্য কোন সতর্ক বার্তা?

টোনি তার কমপিউটারে ডুবে থাকে। ইন্টারনেটে ঝুঁদ হয়ে ই-মেল পর্দায় অক্ষর ফুটে ওঠে। তারপর সেন্ড বোতামে আঙুল ছোঁয়ায়। পর্দায় তার পাঠানো মেল-এর উত্তর–টোনি এ কদিন কোথায় ছিলে? আমার চ্যাটরুম তোমার অপেক্ষায় ছিল এতদিন।–আমি মার্ক ওয়েভ রিজার। একজন ফার্মাসিস্ট।–ড্রাগ নাও তুমি?–কখনও কখনও।–হাই টোনি। আমি ওয়েন্ডি। একজন লাইব্রেরিয়ান।–মোটেই উত্তেজক, কাজ নয়।– অবশেষে, জঁ ক্লদ পেরেত। –Bonnenuit Comment CA VA, কেমন আছ টোনি?–আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ?–তোমায় মিস্ করছি। দেখা করতে চাই তোমার সঙ্গে।–আমিও তাই চাই। তোমার ছবি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ।– এইভাবেই টোনির প্রতিরাত কাটে।

পরদিন সকালে অ্যাশলের ডাক পড়ে শেন মিলারের কেবিনে। মিলার বলে,–কুইবেক এ একটা কমপিউটার সম্মেলন হচ্ছে। সারা পৃথিবী থেকে বিখ্যাত কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা আসবে। তুমি কি আগামী বড়দিনটা কুইবেক শহরে কাটাতে চাও?– হাসে অ্যাশলে,–তার মানে আমাদের কোম্পানি ঐ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে?–হ্যাঁ, আমরা এক সপ্তাহ থাকব।–

টোনির সঙ্গে জঁ ক্লদ-এর চ্যাটরুমের মাধ্যমে কথাবার্তা চলছিল। টোনি জানায় ঐ সম্মেলনের কথা। কবে যাচ্ছে তারা জানতে চায় ক্লদ। সপ্তাহ দুই পরে জানায় টোনি। তাদের দুজনেরই মনে হল খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

প্রতি রাতে অ্যাশলে টেলিভিশনের খবরে টিব্বলের হত্যা রহস্যের সাম্প্রতিক অবস্থা জেনে নিত। কোন নতুন অগ্রগতির খবর না পেয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করত সে। অ্যাশলের কোন সম্পর্ক এই খুনের সঙ্গে পুলিশ যদি বার করতে না পারে তবে তার বাবাকেও ছুঁতে পারবে না। তবে অ্যাশলের সুরক্ষার জন্যেই তো বাবার খুনি হয়ে ওঠা। পরদিন সে বাবাকে ফোন করে বলে,–বাবা, আমাকে আমার কোম্পানির থেকে একটা কমপিউটার সম্মেলনে পাঠাচ্ছে। বড়দিনের সময়। কুইবেক শহরে।– বাবা বললেন,–আমিও ঐ সময়ে যাব তোমার সঙ্গে। তখন আমারও কাজের চাপ কম থাকে। তোমার হোটেলে আমার, জন্যও একটা ঘর নিয়ে রাখবে।– অ্যাশলে অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি জানায়।

২১শে ডিসেম্বর গ্লোবাল কমপিউটারের দলটা জ লিসেজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে নামল। রাস্তায় ঘন বরফ। শূন্যেরও কয়েক ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রা। শাটে ফ্রন্টেসকা হোটেলে এল দলটা। ঘরে এসে টোনি জঁ ক্লদকে ফোন করে। জঁ ক্লদ বলে,–Mais mon, তুমি এত কাছে এসেছ ভাবতেই পারছি না। কখন দেখা হবে?– টোনি বলে,–কাল সকাল নটায় আমরা কনভেনশনে যাব। তার মধ্যে সময় করে ঠিক দেখা করব। দুপুরে একসঙ্গে খেতে পারি।–গ্র্যান্ডে আলি ইজ্জত-এ ভাল রেস্তোরাঁ আছে, নাম লা-প্যারিস বেট। ওখানে দুপুর একটায় পৌঁছে যাব।–ঠিক আছে আমি আসব।–

রেনে লাভসলিয়ে বুলেভার্ড রাস্তার ওপর দ্যা সেন্টার দেস কংগ্রেস দা কুইবেক-এর কাঁচ আর ইস্পাতের তৈরি বহুতল বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। চার তলার হলঘরটায় এক হাজার লোক ধরে। পুরো ঘরটা পৃথিবীর নানা দেশের কমপিউটার-এর সঙ্গে জড়িত মানুষজনে ঠাসা। আধডজন সেমিনার চলছে একই সঙ্গে। মাল্টিমিডিয়া রুম ও ভিডিও কনফারেন্স সেন্টার ভিড়ে ঠাসা। পৌনে একটায় টোনি কনভেনশন সেন্টার থেকে বেরিয়ে আসে। ট্যাক্সি নিয়ে লা প্যারিস বেক্সট রেস্তোরাঁয় পৌঁছে যায়। জ ক্লদ চিনে নেয় সহজেই কারণ আগে ছবি দেখেছে। টোনি টেবিলের কাছে পৌঁছতেই সে উঠে দাঁড়ায়। বলে,–এই শহরে তোমার দিনগুলো খুব ভাল কাটবে। ঘুরে বেড়ানোর দুর্দান্ত সুন্দর জায়গা আছে।– ওয়েটার মেনু নিয়ে আসে। Nons Voudrions ie brome lake ducklings-এর অর্ডার দেয় সে। টোনিকে বলে,–এটা চুছো করা হাঁসের সঙ্গে প্রচুর মশলা, সস দেওয়া আপেলের রসে ডোবানো।–খুব সুস্বাদ নিশ্চয়ই।–

খেতে খেতে ওরা নিজেদের অতীত সম্পর্কে খুলে বলে। তারা দুজনেই অবিবাহিত। স্কি করতে দুজনেই ভালবাসে। টোনি ভাবে জঁ ক্লদ-এর মধ্যে একটা উৎসাহ রয়েছে যেটা বালকোচিত। টোনি এর আগে কোন পুরুষের সঙ্গে এত সহজে মিশতে পারেনি। এরপর থেকে প্রতিদিনই তারা একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া সারতে আর শহর ঘুরতে যেত।

বড়দিন যত এগিয়ে আসছিল অ্যাশলে ততই ভাবছিল, বড় দিনটা বিশ্রীভাবে কাটবে কারণ বাবা আসবে।

একদিন জঁ ক্লদ টোনিকে নিয়ে গয়নার দোকানে যায়। গাঁবেত জুয়েলারি সুসজ্জিত বিশাল দোকান। আধডজন কর্মচারী। জঁ ক্লদ একটা হীরে বসানো আংটি যেটা পান্না দিয়ে ঘেরা

টোনিকে উপহার দিতে চাইল। টোনি বলল,–না, না এটা খুব দামি। তোমার থেকে এই কদিনে যা পেলাম তাই যথেষ্ট।– জঁ ক্লদ জোর করে আংটিটা টোনির আঙুলে পরিয়ে দেয়। টোনি কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা অ্যাশলের কাছে তার বাবার ফোন এল–এবার বড়দিন আমরা একসঙ্গে কাটাতে পারছি না। আমার এক গুরুত্বপূর্ণ ধনী রোগীর স্ট্রোক হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা। আমি কাল সেখানে চলে যাচ্ছি।–

–বাবা, খুব খারাপ লাগছে।– অ্যাশলে গলার স্বর দুঃখিত করে বলে। –পরে আমরা এটা পুষিয়ে নেব।–নিশ্চয়, বাবা সাবধানে থেকো।– ফোনটা রেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলে অ্যাশলে।

ধনী, অভিজাত পাড়ায়, রাস্তার ধারে জঁ প্যালাস-এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রেস্তোরাঁ প্যাভিলিয়ান। রাত সাড়ে দশটায় টোনি ও জঁ ক্লদ সেখানে ঢুকল। ওদের দেখে ওয়েটার এগিয়ে এল। জঁ ক্লদ এর পরিচিত। জঁ ক্লদ টোনির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। হিমশীতল শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জঁ ক্লদ বলে,–আমি ভাবতে পারছি না আমাদের দেখা হল।–আমিও,– টোনি বলল। তখনই বাজনার সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় নানা বয়সী নারী পুরুষ ড্যান্স ফ্লোরে গিয়ে হাজির হল। ওরাও নাচের জায়গায় গিয়ে উদ্দামভাবে নাচতে শুরু করে। নাচ টোনির এক তীব্র প্যাশন। ছোটবেলায় সে যখন নাচত তখন মা বলত,–এটা কি নাচ হচ্ছে না তান্ডব? তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।–

আজ নাচের শেষে জঁ ক্লদ বলল,–অসাধারণ নেচেছে তুমি।–ধন্যবাদ।– মা, তুমি কি শুনতে পাচ্ছে? অ্যাসপারাগাস সুপ, লাল মদে ডোবানো গলদা চিংড়ি, ঝিনুকের রায়তা আর Valpolicella মদ দিয়ে খাওয়াদাওয়া করে টোনির হাতটা নিজের হাতে নিয়ে জঁ ক্লদ বলে,–আজ রাতটা আমার বাড়িতে কাটাবে?– টোনি দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল,–কাল কাটাব।–

পুলিশ অফিসার রেনে পিকার্ড রাত তিনটেয় প্রতি রাতের মত গ্র্যান্ড অ্যালির রাস্তায় টহল দিচ্ছিলেন। লাল ইটের একটা দোতলা বাড়ির সদর দরজাটা হাট করে খোলা। তিনি এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটার কারণ জানতে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন। –বাড়িতে কেউ আছেন। তার স্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে কিছু একটা ঘটেছে। আগ্নেয়াস্ত্রটাকে হাতের মুঠোয় ধরে এগোতে থাকেন তিনি। সারা বাড়ি জুড়ে এল নৈঃশব্দ। এ ছাড়া কিছুই নজরে আসে না। দোতলায় উঠে বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা শোবার ঘর তার নজরে পড়ল। দরজাটা টেনে ধরে ঘরে ঢুকেই চমকে গেলেন। একটি ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ভোর পাঁচটায় ধূসর আর হলুদ রঙের স্ট্রম বুলেভার্ডের তিনতলা বাড়িটা যেটা পুলিশের সদর দফতর, তার একটি ঘরে ইনসপেক্টর পল কাইয়ের অন্য অফিসারের কাছে জানতে চান ঘটনাটা। অফিসার গাই ফনটাইন উত্তর দেন–মৃতের নাম জঁ ক্লদ পেরেত। খুনটা হয়েছে রাত একটা থেকে আড়াইটের মধ্যে। ২৩টি ছুরির আঘাত রয়েছে। জঁ ক্লদ পেরেতের জ্যাকেটের পকেটে প্যাভিলিয়ান রেস্তোরাঁয় রাতের খাওয়ার একটা রসিদ পাওয়া গেছে। জঁ ক্লদ টোনি প্রেসকট নামে একট মহিলাকে নিয়ে ঐ রেস্তোরাঁয় খেতে যায়। প্রধান ওয়েটার নিকোলাস-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার। মৃত্যুর আগে পেরেত কোন মহিলার সঙ্গে যৌন মিলন

করেছিল। একটা লেটার ওপেনার দিয়ে খুন করা হয়েছে। আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে। ল্যাবরেটরিতে সেগুলো পাঠানো হয়েছে।

–টোনি প্রেসকটকে গ্রেফতার করা হয়েছে?– ফনটাইন বলে,–ঐ মহিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের ক্রিমিনাল রেকর্ডে তার নাম নেই। কিন্তু শহরের জন্ম দফতরে কোন জন্ম সার্টিফিকেট নেই, সোশাল সিকিউরিটি নম্বর নেই, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। শহরের কোন হোটেলেও ঐ নামের কাউকে পাওয়া যায়নি। বিমানবন্দর তো রাত বারোটায় বন্ধ হয়ে যায়। শেষ ট্রেন গতকাল বিকেলে ছেড়ে গেছে। ভোরের প্রথম ট্রেন ছটায়। ঐ মহিলার বর্ণনা আমরা বাস স্ট্যান্ড, ট্যাক্সি দফতরে পাঠিয়ে দিয়েছি। স্থল পথে শহর ছেড়ে সে পালাতে পারবেন না।

ল্যাবরেটরি থেকে আঙুলের ছাপের রিপোর্ট আসে। অকুস্থলে পাওয়া আঙুলের ছাপ কমপিউটারে ম্যাচ করানো যায়নি। টোনির কোন ছাপ কমপিউটারের সংরক্ষিত নেই।

.

০৮.

অ্যাশলে কুইবেক থেকে ফেরার পাঁচদিন পর বাবার ফোন এল–আমি আজ সকালে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরেছি।–তোমার রোগী কেমন আছে?–ভাল–তুমি কাল সানফ্রান্সিসকোয় আসতে পারবে? রাতে তা হলে একসঙ্গে খেতাম।–ঠিক আছ।–তা হলে রাত আটটায় লুলু রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করব।–

পরদিন আটটা পনেরো নাগাদ লুলুতে তার বাবা এল। চারপাশের মানুষদের মধ্যে সমীহ ফুটে উঠল। বাবা বলল,–বড়দিনটা একসঙ্গে কাটাতে না পারায় দুঃখিত।–আমিও খুব দুঃখ পেয়েছি বাবা।– অ্যাশলে জোর করে বলে। মুরগির মাংসের পদের অর্ডার দিয়ে বাবা ওর মুখোমুখি বসে। বলে,–কুইবেক শহরের দিনগুলো কেমন কাটল?–দারুণ,–অ্যাশলে শান্তভাবে বলে,–গত মাসে আমি বেডফোর্ড গিয়েছিলাম। পুরনো স্কুলের রি ইউনিয়নে। জানলাম আমরা যেদিন লন্ডনে চলে আসি সেদিনই জিম ক্লেয়ারি খুন হয়।–ঠান্ডা চোখে সে বাবার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে। ডাঃ প্যাটারসন বলেন,–যে তোমার পেছনে লেগে থাকত? তোমায় আমি বাঁচিয়ে ছিলাম ওর হতে থেকে।– অ্যাশলে ভাবে এটা কি বাবার স্বীকারোক্তি?

অ্যাশলে এবার বলে,–ডেনিস টিব্বলেও খুন হয়েছে। জিমের মতই ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও খুন হয়েছে। ডাঃ প্যাটারসন ধীরে ধীরে রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বললেন,–ওর মত নোংরা মানুষরা এইভাবেই মারা যায়। অ্যাশলের মনে হয় ওর বাবা চিকিৎসার মত মহৎ পেশায় নিযুক্ত হয়েও কি নিষ্ঠুর! বাবাকে বোঝা সত্যিই দুঃসাধ্য।

.

অলিটটে আর রিচার্ড মেলটন ডি ইয়ং মিউজিয়ামে দেখা করে। রিচার্ড জানতে চায়–কেমন লাগল কুইবেক শহর?– অলিটটে বলে,–খুব ভাল। এত সুন্দর সব মিউজিয়াম।–মেলটন জানায় তার একটা ছবি একজন শিল্প সংগ্রাহক কিনে নিয়েছেন। অলিটটে খুশি হয়। ওর মনে হয়, মেলটনের সঙ্গ তাকে এক অদ্ভুত আনন্দ দেয়। অন্য কেউ যদি ছবি

বিক্রির কথা বলত তার মনে হত এমন রুচিহীন মানুষ কে আছে যে ওর মত শিল্পীর ছবি পয়সা খরচ করে কিনবে? কিন্তু রিচার্ডের ক্ষেত্রে এরকম কোন চিন্তা ওর মাথায় আসে না। এই অনুভূতিটা ওর ভাল লাগে।

ওরা কাছাকাছি একটা এর রেস্তোরাঁয় দুপুরে খাওয়া সারতে গেল। অলিটটে নিরামিষাশী তাই তার জন্য স্যালাড আর রিচার্ড নিজের জন্য কিমার রোস্ট আনতে চায়। একজন আকর্ষণীয় চেহারার যুবতী খাদ্য পরিবেশনকারিণী এগিয়ে এসে বলে,–হ্যালো রিচার্ড।– রিচার্ড বলে,–হাই বানি।– ওদের কথা বলতে দেখে তীব্র ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে অলিটটে। সে নিজেও অবাক হয়। বার্নির্স চলে গেলে সে বলে,–মেয়েটি কি তোমার পরিচিত?– রিচার্ড হাসে–া অনেকবার এখানে এসেছি তো। প্রথম যখন আসতাম আমার হাতে বেশি পয়সা থাকত না কিন্তু বার্নির্স আমার জন্য একটু বেশি করে খাবার এনে দিত।–হ্যাঁ ওকে আমারও বেশ ভাল মনে হল।– মুখে এ কথা বললেও মনে মনে অলিটটে ভাবে কদর্য একটা মেয়ে।

খেতে খেতে ওরা শিল্প ও শিল্পী বিষয়ে নানা আলোচনা করতে থাকে। খাওয়া শেষ হলে ওরা গ্যালারি মিউজিয়ামে ফিরে আসে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওরা মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসে।

রিচার্ড হঠাৎ বলে,–আমার রুমমেট আজ ফিরবে না। তুমি কি আজ রাতে আমার ফ্ল্যাটে যাবে। অনেক ছবি দেখাব?– অলিটটে রিচার্ডের হাতটাকে নিজের মুঠোয় নিয়ে বলে,– আজ নয়।– রিচার্ড বলে,–আজ নয় কেন? ঠিক আছে তোমার যেদিন ইচ্ছে হয় সেদিনই

যেও।– সে রাতে বিছানায় শুয়ে অলিটটের মনে হল,–অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রিচার্ড আমাকে। মুক্তি দিয়েছে। তারপর রিচার্ডের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমে তলিয়ে গেল।–

রাত দুটোয় রিচার্ডের রুমমেট গ্যারী তার রাতের পার্টি সেরে ফিরে দেখে অন্ধকারে ডুবে আছে গোটা অ্যাপার্টমেন্ট। শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। আলো জ্বালিয়ে সে যে দৃশ্য দেখে তাতে সে আর্ত চিৎকার করে বেরিয়ে আসে।

ডিটেকটিভ হোয়াইটটেকার তার সামনের চেয়ারে বসা আতঙ্কগ্রস্ত গ্যারিকে বলে শান্ত হতে। বলেন,–পুরো ঘটনাটা ভাল করে দেখা যাক, তোমার বন্ধুর কোন শত্রু ছিল না বলছ?–হ্যাঁ।–তোমরা কি প্রেমিক প্রেমিকা?–না, না। আর্থিক সুবিধার কারণে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকতাম।– ডিটেকটিভ হোয়াইটটেকার চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন,–ডাকাতির জন্য খুন করা হয়নি। ডাকাতির জন্য খুন করলে অন্ডকোষসহ লিঙ্গটাকে কেটে দেবে না। তীব্র প্রতিহিংসা বশতই খুন করা হয়েছে। তোমার বন্ধুর কোন প্রেমিক ছিল বলে জান?– গ্যারী বলে,–হ্যাঁ রিচার্ড অলিটটে বলে এচটা মেয়ের কথা খুব বলত। ক্যাপেরটিনোতে থাকে।– দুই ডিটেকটিভ হোয়াইটটেকার আর রেনল্ডস মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

আধঘন্টা বাদে ডিটেকটিভ হোয়াইটটেকার ফোনে শেরিফ ডাওলিংয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বলছিলেন যে ওদের ওখানেও একটা খুন হয়েছে যার মোডাস অপারেন্ডি হুবহু ক্যাপেরটিনোর ডেনিস টিব্বলের খুনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হোয়াইটটেকার বলেন– আমি এফ. বি. আই-এর সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের কমপিউটারে এই ধরনের খুনের তিনটি নজির আছে। একটা দশ বছর আগের। বাকি দুটো সাম্প্রতিক কালে। দশ বছর

আগেরটা পেনিসিলভিনিয়ায় তারপরে ক্যাপেরটিনোকুইবেকসিটি-সানফ্রান্সিসকো– ঘটনাগুলোর মধ্য যেন যোগসূত্র রয়েছে কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছি। FB.-কে খোঁজ নিতে বলেছি কুইবেকে হাজির ছিল এমন কেউ ঐ অন্য দুই শহরে খুনের সময়ে হাজির ছিল কিনা।

সাংবাদ মাধ্যমে খবরটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রোমহর্ষক শিরোনাম দিয়ে এই খুন প্রসঙ্গে খবর বের হতে লাগল

Serial Killer loose...
Quaters Hommes Brutalement Tues Et Casterswir suchen Ein Mann Der Castreșt siene Hopper Maniac De Hommecidal Sullo Spree Cerspoder...

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টিভি চ্যানেলগুলোর মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মতামত জানাতে লাগলেন–.. শিকাররা যেহেতু পুরুষ এবং তাদের পুরুষাঙ্গ কর্তন করা হয়েছে, নিশ্চিত বলা যায় এটা কোন সমকামীর কাজ...

–...হয়ত বারবার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুরুষ বিদ্বেষী কোন মহিলা এ কাজ করেছে...

–...একজন স্বেচ্ছাচারী মা আছেন এমন কোন পুরুষ এ কাজ করেছে...–

ডিটেকটিভ হোয়াইটটেকার শনিবার সকালে শেরিফ ডাওলিংকে ফোন করে,–একটা খবর আছে। FB.I ক্রশ চেকিং করে আমায় একজন আমেরিকানের নাম জানিয়েছে যে পেরেত খুনের সময়, কুইবেক-এ ছিল। তার নাম অ্যাশলে প্যাটারসন।–

শনিবার সন্ধ্যে বেলায় অ্যাশলের ফ্ল্যাটের বেল বেজে উঠল। –কে?–ডেপুটি শেরিফ স্যাম ব্লেক।– দীর্ঘক্ষণ পরে উদ্বিগ্ন মুখে অ্যাশলে দরজা খুলে দাঁড়ায়। –আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।–আসুন, ভেতরে আসুন।– অ্যাশলে ভাবে সর্তক থাকতে হবে। প্রশ্নটা করেই ফেল– আপনারা কি আমায় সন্দেহ করছেন?–না, ঘাবড়ে যাবেন না। নিয়ম মাফিক কিছু প্রশ্ন করব। গত কয়েকদিনের মধ্যে আপনি কানাডার কুইবেক শহরে গিয়েছিলেন?–া, বড়দিনের সময়।–সেখানে জঁ ক্লদ পেরেত-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?—পরিচয় দূরের কথা। ঐ নামের কাউকে চিনি বলে মনে করতে পারছি না। তিনি কে?–কুইবেক শহরে একটি রত্নগয়নার দোকানের মালিক ভদ্রলোক?–তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?– ডেপুটি শেরিফ বলে,–ডেনিস টিব্বলে কিন্তু আপনার সহকর্মী ছিল।–মোটেই না বড়জোর বলা যায় আমরা এক জায়গায় চাকরি করতাম।–বেশ–মাঝে মাঝেই তো আপনি সানফ্রানসিসকো যান, তাই না?–হ্যাঁ, যাই।–সেখানে রিচার্ড মেলটন নামের একজন যুবক শিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়?–না। ঐ নামের কারো সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। তাছাড়া শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই।–তাহলে মিস প্যাটারসন আপনাকে পলিগ্রাফ পরীক্ষায় বসতে হবে। আপনি পুলিশের সদর দফতরে আসবেন।–

পলিগ্রাফ বিশেষজ্ঞের নাম কিথ রসন। পরদিন সকাল এগারোটায় তার মুখোমুখি হল অ্যাশলে। অ্যাশলের হাতে, কপালে, বুকে, মাথায় সরু তার আটকে দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ রসনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল অ্যাশলে। উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা রেখাচিত্র

ভেসে উঠে কাগজে ছাপা হতে থাকে। যেটা অ্যাশলের মানসিক স্থিতি ও ভারসাম্যের রেখাচিত্র।

ডঃ কিথ জিজ্ঞেস করলেন–আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনার বয়স কত?–আঠাশ।–আপনার থাকা হয় কোথায়?–১০৬৯৪ ভায়া কামিনে কোর্ট, ক্যাপেরটিনো। –আপনি চাকরি করেন?–হা।–রাগপ্রধান সঙ্গীত পছন্দ করেন?–হ্যাঁ।–আপনি রিচার্ড মেলটনকে চিনতেন?–না।–

ডঃ রসন দেখেন-রেখাচিত্রে এখনও পর্যন্ত কোন পরিবর্তন নেই। যার অর্থ অ্যাশলের প্রতিটি উত্তরই সঠিক।

আবার প্রশ্ন শুরু হয়। আপনি কোথায় চাকরি করেন?–গ্লোবাল কমপিউটার গ্রাফিক্স করপোরেশনে।–চাকরিটা আপনার মনের মত?–হ্যাঁ।–সপ্তাহে কদিন কাজ করেন?–পাঁচদিন।–জঁ ক্লদ পেরেত আপনার কেমন বন্ধু ছিলেন?–ঐ নামের কাউকে চিনি না।–রেখাচিত্রে কোন পরিবর্তন নেই। –সকালে কী খেয়েছেন?–টোস্ট, ডিমের পোচ, কালো কফি।– রেখাচিত্রে পরিবর্তন নেই। অ্যাশলেকে ছেড়ে দিয়ে ডঃ রসন শেরিফের ঘরে গিয়ে বললেন,–অ্যাশলে প্যাটারসন ১০০ শতাংশ সত্যি উত্তর দিয়েছে। ও নির্দোষ।–

পুলিশ দফতর থেকে স্বস্তির সঙ্গে বের হয়ে আসে অ্যাশলে। ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। বাবাকে জড়িয়ে কোন প্রশ্ন না করায় ও নিশ্চিন্ত। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গাড়ি রেখে এলিভেটরে করে উঠে গরম জলে স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে চমকে যায়। বাথরুমের আয়নায় দেখে লাল লিপস্টিক দিয়ে কেউ লিখে রেখেছে–তুমি মরবে।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে সে।

.

০৯.

আঙুলগুলো এমন থরথর করে কাঁপছিল যে অ্যাশলে তিনবার চেষ্টা করেও নম্বর ডায়াল করতে পারছিল না। শেষে দমবন্ধ করে চেষ্টা করে ডায়াল করে। ও প্রান্ত থেকে আওয়াজ আসে–হ্যালো, শেরিফের অফিস।–স্যাম ব্লেককে দেবেন?–উনি বেরিয়েছেন।–উনি ফিরলেই বলবেন অ্যাশলে প্যাটারসন ফোন করেছিল।–ঠিক আছে।–

ঘণ্টা খানেক পরে সহশেরিফ এলেন। তার আগে আশলেকে ফোন করেছিলেন। তিনি আসা মাত্রই অ্যাশলে তাকে স্নান ঘরে আয়নার লেখাটা দেখায়। –কে এটা করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?–জানি না–এই ফ্ল্যাটের চাবি থাকে আমার কাছে।– বলতে বলতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শেরিফ তার পিঠে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হাত রাখেন। বলেন,–আপনাকে পাহারা দেওয়া এখন আমার দায়িত্ব।–

অ্যাশলে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,–আসলে ওই আতঙ্কে আমি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি।–ডেপুটি শেরিফ বলেন,–খুবই স্বাভাবিক।– অ্যাশলে গরম কফি আর বিস্কুট নিয়ে আসে। সোফায় বসে খেতে খেতে শেরিফ বলেন,–কতদিন হল এসব শুরু হয়েছে।– তা প্রায় মাস ছয়েক। আমার ফ্ল্যাটে বারবার কেউ ঢুকে পড়ছে। আমায় অনুসরণ করছে। ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখতাম সব আলো জ্বলছে। ফ্ল্যাটে সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখতাম।–ব্লেক বললেন,–আপনার কোন প্রেমিক ছিল যাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন?–না।–

ব্লেক উঠে দাঁড়ায়। অ্যাশলে বলে,–এই ফ্ল্যাটে আজ রাতে আমি একা কিছুতেই থাকতে পারব না।–থানা থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে।–আ, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। আপনি থেকে যান।–আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। আপনার কোন বন্ধু-বান্ধবীকে আসতে বলুন।–যদি তাদের মধ্যেই কেউ এ কাজ করে থাকে।–তাও বটে। ঠিক আছে। আমি থেকে যাচ্ছি। তবে আমাকে দুটো ফোন করতে হবে। একটা বড় কর্তা ডাওলিংকে। অন্যটা আমার স্ত্রীকে।–

ফোন দুটো সেরে আসার পর অ্যাশলে বলে,–আপনি শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি সোফায় শুয়ে পড়ছি।– স্যাম ব্লেক বলেন,–আমি আরাম করে ঘুমোবার জন্য তো ওখানে থাকছি না। আপনি শোবার ঘরে যান। আমি এই সোফায় শুয়ে পড়ছি।– ধন্যবাদ জানিয়ে অ্যাশলে শুতে চলে যায়। স্যাম ব্লেক জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করে সোফায় এসে শুয়ে পড়েন।

ওয়াশিংটনের এফ বি আই সদর দফতরে বড়কর্তা রেনল্ড কিংসলের সঙ্গে ডিটেকটিভ রামিরেজের কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন,–বেডফোর্ড, ক্যাপেরটিনো, কুইবেক, সানফ্রানসিসকোর খুনের জায়গাগুলোর হাতের ছাপ, আঙুলের ছাপ এবং ভিশন-এ টেস্টের রিপোর্ট এসে গেছে। সব ম্যাচ করে গেছে।– কিংসলে বলেন,–তার মানে এগুলো একজন সিরিয়াল কিলারের কাজ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে গ্রেফতার কর।–

পরদিন ভোরে ডেপুটি শেরিফ স্যাম ব্লেকের মৃতদেহটা অ্যাশলের ফ্ল্যাটের পিছন দিকের সরু গলিতে দেখতে পান বাড়ির সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর স্ত্রী। নগ্ন মৃতদেহটি ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

.

১০.

পুলিশের বড় কর্তা ডাওলিং, দুজন সাদা পোশাকের গোয়েন্দা এবং দুজন উর্দিধারী পুলিশ কর্মী অ্যাশলেকে ঘিরে ছিল। অ্যাশলে কেঁদে চলেছিল কাঁপতে কাঁপতে। –একমাত্র আপনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন মিস প্যাটারসন।– শেরিফ বলেন। অ্যাশলে প্রাণহীন চোখে বলে,–আমি চেষ্টা করছি।– শেরিফ বলেন,–গোড়া থেকে শুরু করুন।– গতরাতে স্নান ঘরের আয়নার ঐ লেখাটার কারণে আতঙ্কিত হয়ে আমিই ওঁকে থাকতে বলি। এই সোফায় উনি শুয়েছিলেন। ওঁকে বালিশ, কম্বল দিয়ে আমি শোবার ঘরে চলে যাই। ঘুম আসছে না বলে ঘুমের ওষুধ খাই। তারপর সকালে ঘুম ভাঙে পেছনের গলি থেকে চিৎকারে।– শেরিফ তার সহকর্মীদের বলেন,–গোটা বাড়িটা ভাল করে খুঁজে দেখুন। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমাকে জানাবেন।– শেরিফ এবার অ্যাশলেকে বলেন,–আপনার কি মনে হয় গতরাতে সেই আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকে স্যামকে খুন করেছে।– অ্যাশলে কেঁদে ওঠে,–আমি কিছু জানি না।–

গোয়েন্দা এলটন তখনই বলে,–স্যার, এদিকে একটু আসবেন?– রান্নাঘরের সিঙ্কের মধ্যে মাংস কাটা ধারালো রক্তমাখা ছুরি। এলটন বলে,–ভালই হল। আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে।– দস্তানা পরে ছুরিটা এলটন প্লাস্টিকের খাপে ঢুপিয়ে দিল। কিন্তু শেরফি ভাবছেন খুনি এভাবে খুনের অস্ত্র ফেলে গেল কেন?

গোয়েন্দা কোস্তফ এসে বলে,–স্যার আমি এই অত্যন্ত দামী গয়নাটা আলমারিতে পেলাম। আংটিটার বাক্সে কানাডার কুইবেক শহরের এক গয়নার দোকানের ঠিকানা লেখা।– শেরিফ দেখেন হিরে বসানো আংটিটার চারপাশে ছোট ছোট পান্না বানো। আংটিটা দেখতে দেখতে শেয়ালের মত হাসি ফুটে উঠল শেরিফের মুখে। তিনজনই অ্যাশলের কাছে এলেন। জানতে চাইলেন ছুরিটা তার কিনা। অ্যাশলে শূন্য চোখে বলে,–হতে পারে।–আংটিটাও কি আপনারই?– অ্যাশলে আংটিটা দেখে বলে,–না, এত দামি গয়না আমার নয়।– শেরিফ বলেন,–কুইবেক শহরে খুন হওয়া এক গহনার দোকানের মালিক জঁ ক্লদ পেরেত টোনি প্রেসকটকে এই আংটিটা উপহার দিয়েছিল।– অ্যাশলে বিস্মিত বিবর্ণ হয়ে বলে,–এটা কি করে আমার ঘরে এল?–

তখনই পুলিশ কর্মীদের একজন এসে বলে, স্যার, করিডর ঘরে রক্তের দাগ।– স্যাম বলেন,–তার মানে স্যামকে এই ফ্ল্যাটে খুন করে টেনে নিয়ে গিয়ে এলিভেটরে করে নীচে নেমে ফেলে দেওয়া হয়েছে।– শেরিফ বললেন,–মিস প্যাটারসন, আপনাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হচ্ছি।– অ্যাশলে চমকে ওঠে। যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ায়। শেরিফ বলে,–আপনি আইনজীবিকে ফোন করতে পারনে।– অ্যাশলে বলে,–তার দরকার নেই। বাবাকেও এসব জানাতে চাই না।–

শেরিফ ভাবছিলেন পলিগ্রাফ টেস্টেই তো অ্যাশলে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তথ্য প্রমাণ তো ইঙ্গিত করছে সিরিয়াল কিলার হল ঐ অ্যাশলে প্যাটারসন। এমন সময় গোয়েন্দা কোস্তভ এসে বললেন,–স্যার, ডেপুটি শেরিফের সঙ্গে তার মৃত্যুর আগে কারও যৌনমিলন হয়েছিল। অতি বেগুনী রশ্মির সাহায্যে প্রমাণ করে দেখা গেছে, স্যার-এর

শরীরে বীর্য ও নারী-যোনিরসের চিহ্ন রয়েছে। তীব্র ভাবে বিস্মিত হল প্যাটারসন। ঐ অ্যাশলের সঙ্গে স্যাম-এর যৌনমিলন হয়েছিল? ব্যাপারটা আরও জট পাকিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় শেরিফ ডাওলিং তার অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে কেসটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় ফোন বাজল। ডাওলিং বললেন,–হ্যালো,–FBI-এর সদর দফতর থেকে স্পেশাল এজেন্ট রামিরেজ বলছি। আমরা অ্যাশলে প্যাটারসনের কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড পাইনি। যেহেতু ১৯৯৮-এর আগে গাড়ি চালানোর লাইসেন্সের জন্য আঙুলের ছাপ নেবার কোন প্রয়োজন হত না...।– এর পর প্রায় মিনিট দশেক শেরিফ আর রামিরেজ-এর কথা চলল ফোনে। শেরিফের মুখের অভিব্যক্তি বদলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে–অবিশ্বাস্য,–কি আশ্চর্য, হে ভগবান– ইত্যাদি মন্তব্য করছিলেন। ফোন নামিয়ে রেখে দীর্ঘসময় গুম হয়ে বসে রইলেন। পরে বললেন–এফ বি আই সদর দপ্তরের ফোন ছিল। ওরা সব কটি মৃতদেহের ফিঙ্গার প্রিন্ট যাচাই করে দেখেছে একজনই খুনগুলো করেছে।– একটু থেমে আবার বললেন শেরিফ,–কুইবেক শহরে জঁ ক্লদ পেরেত মৃত্যুর আগে এক ইংরেজ মহিলা যার নাম টোনি প্রেসকট তার সঙ্গে মেলামেশা করেছিলেন। সানফ্রান্সিসকোতেও একজন ইতালিয় মহিলা অলিটটে পিটার্সকে, রিচার্ড মেলটন খুন হওয়ার আগে তার সঙ্গে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। আর স্যাম ব্রেক ছিলেন অ্যাশলে প্যাটারসনের সঙ্গে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন শেরিফটোনি প্রেসকট, অলিটটে পিটার্স, অ্যাশলে প্যাটারসন ওরা একই ব্যক্তি।

সম্পত্তি বেচাকেনাকারী সংস্থা

১১.

সম্পত্তি বেচাকেনাকারী সংস্থা ব্রায়ান্ট অ্যান্ড ক্রোটহার-এর অন্যতম মালিক রবার্ট ক্রোটহার। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বলেন–এই বারান্দার থেকে শহরের সুন্দর দৃশ্যবলী দেখতে পাবেন।– তরুণ দম্পতি যুগলকে দৃশ্য দেখবার সুযোগ করে দিতে একটু সরে আসেন। সওদা করা যাবে কিনা ভাবতে থাকেন। তরুণ দম্পতিটি নিজেদের উত্তেজনা গোপন করার চেষ্টা করছে এবং ক্রোটহার তাতে অবাক হয় না। কারণ ক্রেতা কখনই পছন্দ প্রকাশ করার চেষ্টা করে না, ভাবে তাতে বিক্রেতাকে মাথায় তোলা হবে। অবশ্য সানফ্রান্সিসকোর এই অভিজাত অঞ্চলে এমন একটা পেন্ট হাউস ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটের দাম খুবই বেশি। ওরা কি দিতে পারবে? যদিও ওদের বেশ ভাল লেগেছে ক্রোটহারের। স্বামী ডেভিড সিঙ্গার। ত্রিশ বছর বয়স, সুদর্শন, বুদ্ধির ছাপ চেহারায়, সোনালী চুল, ছটফটে। সান্দ্রা স্ত্রী। ২৭-২৮ বছর বয়স। উষ্ণ, আবেগপ্রবণ চরিত্রের আমুদে মেয়ে বলেই মনে হয়।

সারা ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখা হয়ে গেলে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটু দূরে সরে গিয়ে। মাসে ৬০০০ ডলার ভাড়া আমরা কি দিতে পারব?– ডেভিড বলে,–আমরা এখনি নিতে পারছি না ফ্ল্যাটটা। তবে বৃহস্পতিবারের পরে আমরা ফ্ল্যাটটা নিতে পারব। বোতল থেকে জিন বের হয়ে এসে আমায় বর দেবে।– সান্দ্রা হাসে। –তবে ফ্ল্যাটটা কিনেই ফেলি।– ক্রোটহারকে বলে,–আমরা এটা নিচ্ছি।–অভিনন্দন। আপনি একটা দারুণ বাড়ির মালিক হলেন। দশ হাজার ডলার দিলে আমি কাগজপত্র তৈরি করব।–

সান্দ্রা ডেভিডের হাত ধরে বলে,–ডেভিড, সত্যি ব্যাপারটা ঘটছে তো? আমার যেন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।– ডেভিড বলে,–তোমার সব স্বপ্নই আমি পূরণ করব।– ওদের শিশু আসছে। মারিনা জেলায় এল ঘরের একটা ফ্ল্যাটে ওরা থাকে। সেখানে সত্যিই অসুবিধা হবে। এখানে ফ্ল্যাট কেনা তো গর্বের কথা। একটু ভদ্রস্থ অঞ্চলে দুতিন ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়াই দুঃসাধ্য ছিল। –ল ফার্ম টার্নার বস অ্যান্ড রিপলির মাঝারি চাকুরে ডেভিড সিঙ্গারের পক্ষে। কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতিতে নাটকীয় মোড় এল। ওর ফার্মের মালিকপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় পরিশ্রমী ও সৎ কর্মী ডেভিড সিঙ্গারকে কোম্পানির অন্যতম অংশীদার করে নেওয়া হবে। কোম্পানির প্রতিষ্ঠা দিবস বৃহস্পতিবারে ঘটবে। আরও পঁচিশজন প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে ডেভিডের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। তার কোম্পানি তরুণ কর্মীদের নিদারুণভাবে খাঁটিয়ে নিয়ে এই অংশীদারিত্বের প্রলোভন দেখায়। গত ছয় বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে অবশেষে এই পুরস্কার ডেভিড পাচ্ছে। বেতন দেড় দুই গুন বেড়ে যায়। কোম্পানির লভ্যাংশ থেকে মোটা প্রাপ্তি। বিদেশযাত্রার সুযোগ। অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

তিন বছর আগে এক ডিনার পার্টিতে ডেভিড ও সান্দ্রার পরিচয় হয়। সান্দ্রা এক কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। ডেভিড কোম্পানির ক্লায়েন্টের মেয়েকে সঙ্গিনী করে গিয়েছিল। সেই সময় আলোড়ন তোলা এক কোর্ট কেস নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। তর্ক মিটিয়ে ওরা সৌজন্যমূলক নাচে যোগ দেয়। পরদিন দুপুরে ডেভিডের ফোন,–কালকের আলোচনাটা শেষ করতে চাই। রাতে কোথাও খেতে যেতে পারি?– ঠিক আছে,–হাসে সান্দ্রা।–

সেই শুরু। তারপর ওরা ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয় এবং এক বছর পরে বিয়ে করেন। সান্দ্রা অবশ্য চাকরি ছাড়েনি বিয়ের পরেও। এখন মাতৃত্বের প্রয়োজনে কয়েক মাস বা চিরদিনের জন্যই চাকরি থেকে সরে আসতে হবে। আগে হলে সম্ভবনাটা ওদের আতঙ্কিত করত। কিন্তু এখন এটা কোনও সমস্যাই নয়।

বৃহস্পতিবার সকালে অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ডেভিড। টেলিভিশন দেখছিল। একজন সংবাদপাঠক বললেন, সানফ্রান্সিসকোর পৃথিবীখ্যাত প্রথিতযশা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসক স্টিভেন প্যাটারসনের একমাত্র মেয়ে অ্যাশলে প্যাটারসনকে সন্দেহভাজন সিরিয়াল কিলার হিসাবে এফ. বি. আই. গ্রেফতার করেছে।– ডেভিড থমকে যায়। মনের মধ্যে নানা স্মৃতি ভেসে ওঠে।

তখন একুশ বছর বয়স তার। আইন কলেজে ঢুকেছে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখে তার মা অজ্ঞান হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে হাসপাতালে। ভর্তি করে। মাকে দেখে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকটি বের হয়ে এলে ডেভিড তাকে জিজ্ঞেস করে,–মায়ের অবস্থা কেমন?–ওনার মিট্রল কোর্ড-এ একটি র‍্যাপচার দেখা গেছে। বেশিদিন অপেক্ষা না করে মিনি হার্ট সার্জারি করতে হবে। যা করতে পারেন ডাঃ প্যাটারসন। যাতে ওঁর অশক্ত শরীরে কোনরকম বেশি কাটা ছেঁড়া করতে হয় না। সার্জারি না করলে সপ্তাহখানেক বাঁচিয়ে রাখা যাবে। তার বেশি নয়।–

পাবলিক ফোন বুথ থেকে ডাঃ প্যাটারসনের অফিসে ফোন করে ডেভিড। কিন্তু কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না। ছয় মাস অবধি সময় নেই। –ছয় মাস আমার মা বেঁচে থাকবেন না।–তাহলে অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করুন।– পরদিন সকালে ডাঃ

প্যাটারসনের চেম্বার ক্লিনিক ও অফিসে এসে হাজির হয়। বাইরের ঘরটা ভিড়ে ঠাসা। রিসেপশনে গিয়ে ডেভিড বলে তার প্রয়োজনের কথা। রিসেপশনিস্ট মাঝবয়সী মহিলা বলেন,–ছয় মাস অবধি সময় নেই কালই তো বলেছি।– সে তবু অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে বিকেলের দিকে ঘর ফাঁকা হয়ে যায়। ডিউটি শেষে মহিলাটি উঠতে উঠতে বলেন,–আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। ডাঃ প্যাটারসন বাড়ি চলে গেছেন।–

পরদিন বিকেলে ডাঃ প্যাটারসনের ক্লিনিকে গিয়ে ডেভিড মাটির নিচের গাড়ি রাখবার। জায়গায় গিয়ে হাজির হল। একজন কর্মী কারণ জানতে চাইলে ডেভিড বলে,–আমার স্ত্রী চেক আপে গেছে। তাই চারদিকটা ঘুরে দেখছি। ডাঃ প্যাটারসনের ফ্যান্সি গাড়িটার প্রশংসা শুনলাম।–ঐ ধূসর রঙের রোলস রয়েসটা ওঁর গাড়ি।– বলেই কর্মচারীটি প্রবেশ পথের দিকে এগিয়ে যায়। একটা গাড়ি ঢুকছে। তার জায়গা করে দিতে হবে।

ডেভিড দ্রুত চারপাশে দেখে নিয়ে গাড়িটার পেছনের আসনের মেঝেতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রায় আধঘণ্টা বাদে ঝাঁকুনি টের পেয়ে সে বোঝে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আরও কিছুক্ষণ ঐভাবে শুয়ে থেকে সে উঠে বসে। ডাঃ প্যাটারসন ভীষণ চমকে যান। তারপর বলেন,–এটা যদি ডাকাতি হয়, আমার কাছে কানাকড়িও নেই।–গাড়ি ঘোরান। ঐ পার্কটার গা ঘেঁষে দাঁড় করান।– ডাক্তার তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। বলেন,–ঘড়ি, টাকাপয়সা, এমনকি গাড়িটাও নিয়ে নাও। কিন্তু অহেতুক খুনোখুনি আমি পছন্দ করি না।–ডাক্তারবাবু আমি ডাকাত নই। আমার মা মৃত্যুশয্যায়। তাকে বাঁচাতে আপনার সাহায্য চাই। আমি কোন কথা শুনব না। আপনার সময় আছে কি নেই আমি জানতে চাই না।–ঠিক আছে আমি ওনাকে দেখব। তবে কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না।– ডেভিড এবার দ্বিধার সঙ্গে বলে,–আপনার পারিশ্রমিক আমি দিতে পারব না। তবে কথা

দিচ্ছি, ভবিষ্যতে দাম শোধ করে দেব।– ডাঃ প্যাটারসন হাসেন। বলেন–বেশ তাই হবে।–

পরদিন সকালে ডাঃ প্যাটারসন তার মাকে পরীক্ষা করে বললেন রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এক্ষুনি অপারেশন করব। তারপর দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা। তারপর ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। ডেভিড বলল,–মা কেমন আছে?–খুব ভাল। শক্ত মনের মানুষ উনি।– ডেভিড এক প্রবল আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। প্যাটারসনের হাত চেপে ধরে বলে,–আপনি ভগবান ডাক্তারবাবু।–ঠিক আছে। কিন্তু তোমার নামটা কী।–ডেভিড।–ডেভিড তোমার মায়ের এই অপারেশনটা আমি দুটো কারণে করলাম। প্রথমত চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক দিয়ে এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। দ্বিতীয় কারণ তুমি। আমিও তোমার মত মাকে খুব ভালবাসতাম। অসম্ভবকে সম্ভব করার জেদও ছিল তোমার মত। কিন্তু আমার পারিশ্রমিকটা যে দেবার সময় হয়েছে। কিন্তু আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি...–অত দেরী কেন? এখনই বরং ধার শোধ করে দাও।–

–কীভাবে?–তুমি তো গাড়ি চালাতে পার তাহলে আমায় বাড়ি পৌঁছে দাও। কাল থেকে রোজ সকালে সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে ক্লিনিকে পৌঁছে দেবে। আবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় বাড়ি পৌঁছে দেবে।–নিশ্চয়ই।– আসলে যে ডাঃ প্যাটারসন তাকে রোজগারের একটা সুযোগ করে দিলেন তা বুঝতে ডেভিডের দেরী হয়নি। কারণ প্রতিমাসে তাকে বেতন দেওয়া হত। একটু একটু করে মানুষটাকে চিনতে পারছে ডেভিড। বদরাগী, দাম্ভিক, অথচ নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবামূলক কার্যে জড়িত। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী জাতীয় আইন নিয়ে তুমি পড়াশোনা করছ?–অপরাধমূলক আইন নিয়ে।–

কেন? যাতে ঐ অপরাধীগুলো পার পেয়ে যায়?–না স্যার। অনেক সময় নিরাপরাধ মানুষও আইনের বেড়াজালে আটকে পড়েন। আমি তাদের হয়ে লড়তে চাই।–বেশ। এই স্পিরিটটা ধরে রাখ। আমার শুভেচ্ছা রইল।– আইন পরীক্ষায় পাশ করার পর গাড়ি চালকের কাজ থেকে নিজেই ডেভিডকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ডাঃ প্যাটারসন ও ডেভিডের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকলেও খবরের কাগজ ও টেলিভিশনে নানা খরব পেত। যেমন–

ডাঃ স্টিভেন প্যাটারসন এইডস রোগাক্রান্ত শিশুদের জন্য দাঁতব্য চিকিৎসালয় খুললেন।

আজ কিনিয়ায় প্যাটারসন মেডিকেল সেন্টার-এর উদ্বোধন করবেন ডাঃ প্যাটারসন।

গতকাল থেকে প্যাটারসন দাঁতব্য আশ্রম-এর কাজ শুরু হয়েছে।

মনে হোত যার যা প্রয়োজন সবেতেই সাহায্যের জন্য ডাঃ প্যাটারসন প্রস্তুত। সান্দ্রার কথায় চমক ভাঙে ডেভিডের। বলে–পুলিশ ডাঃ প্যাটাসনের মেয়েকে সিরিয়াল কিলারের ঘটনায় গ্রেফতার করেছে।–সে কি?– সান্দ্রা চমকে যায়। ডেভিড বলে,–মা সাত বছর বেঁচেছিল ডাঃ প্যাটারসনের জন্যই। ওরকম মানুষের মেয়ে হয়ে কিনা...–

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে ডেভিড। তারপর বলে,–আমি চললাম।– সান্দ্রা চেঁচায়,–খেয়ে যাও।–না। আর খেতে ইচ্ছে করছে না।– সান্দ্রা ডেভিডের কাছে সরে এসে আলতো করে একটা চুমু খায়। বলে,–আজ রাতে আমরা বাইরে খাব। সেলিব্রেট করব।–সেলিব্রেট করব– শব্দগুলো ডেভিডের মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বহু বছর

আগে অন্য একজনকে বলেছিল,–আমরা বাইরে খাব। সেলিব্রেট করব।– তারপর সে খুন করেছিল তাকে।

অফিসের নিজের টেবিলের দিকে যেতে যেতে নতুন কেবিনটার দিকে নজর পড়ে তার। উঁকি দিয়ে দেখল। সুন্দর করে সাজানো। হয়ত তার হবে এই কেবিনটা। অন্যতম মালিক মিঃ কিনসেইড-এর ব্যক্তিগত সচিব হোলির সাথে দেখা হল তার। হোলি বলে,– সুপ্রভাত, কিনসেইড বিকেল পাঁচটায় তার ঘরে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।– নিশ্চয়। এরপর সে নিজের কাজে মন দেয়। প্রায় বারোটা নাগাদ রিসেপশন থেকে ফোন আসে, একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। –কে?– ডাঃ স্টিভেন প্যাটারসন। ডেভিড প্রায় লাফিয়ে ওঠে। ডাঃ প্যাটারসন নিজে এসেছেন। সে বলে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিতে।

ডাঃ প্যাটারসন এলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। –আসুন আসুন, বসুন ডাঃ প্যাটারসন।– ডেভিড আবেগ চেপে রেখে বলে। –হলো ডেভিড,– ডাঃ প্যাটারসন বলেন। ডেভিড বলে,–আজ সকালেই টেলিভিশনে খবরটা পেলাম। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। আমার মনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে।– ডাঃ প্যাটারসন বলেন,– জানি আমি। আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি ডেভিড।–নিশ্চয়ই।– ডাঃ প্যাটারসন বললেন,–আমি চাই তুমি অ্যাশলের আইনজীবী হয়ে দাঁড়াও।– ডেভিড বলে,–কিন্তু আমি তো ক্রিমিনাল লইয়ার নই। আমি কোন সেরা ক্রিমিনাল আইনজীবিকে ঠিক করে দিতে পারি।– ডাঃ প্যাটারসন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,–কাল খবরটা জানাজানি হতে কমপক্ষে একশজন অপরাধ আইনবিদ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু তারা

সবাই এই হাই প্রোফাইল কেসে জড়িয়ে প্রচারের সুযোগ নিতে চায়। আমার মেয়ের ব্যাপারে তাদের কোন, উদ্বেগ নেই। তাই তোমার কাছে আসা।–

ডেভিড বলে,–আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি কর্পোরেট লইয়ার। আমি কোন ক্রিমিনাল কেসের দায়িত্ব নিতে পারি না।– ডাঃ প্যাটারসন বললেন,–অ্যাশলে কোন ক্রিমিনাল নয়।– স্থির চোখে ডেভিডকে দেখতে দেখতে বললেন,–অ্যাশলে আমার সব কিছু।– ডেভিডের শরীরে শিহরণ খেলে যায়। প্রায় একই কথা বহু বছর আগে ডাঃ প্যাটারসনকে বলেছিল তার মায়ের সম্বন্ধে। ডাঃ প্যাটারসন বলেন,–ল-ফার্মে যোগ দেবার আগে তুমি ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে আদালতে কাজ করেছ।– ডেভিড বলে,–সে বহু বছর আগেকার ঘটনা।–এমন কিছু আগেকার ঘটনা নয়। তোমার মুখে শুনেছি আইনবিদ হয়ে নিরপরাধ মানুষকে বাঁচানো তোমার কতখানি ইচ্ছা ছিল। আজ হঠাৎ তুমি কর্পোরেট ল-ইয়ার হলে কেন?– এবার একটা কাগজের টুকরো বার করে ডেভিডকে দেন ডাঃ প্যাটারসন। ডেভিড কাগজটা দেখেই বুঝতে পারে ওটাতে কী লেখা আছে।

প্রিয়, ডাঃ প্যাটারসন,

আমি আপনার কাছে কতটা ঋণী তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আপনার সৌজন্যে আমি কৃতার্থ। আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। যে কোন প্রয়োজনে কোন প্রশ্ন ছাড়াই আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকব ভবিষ্যতে।

ডেভিড তার মায়ের হার্ট অপারেশনের পরে এটা লিখেছিল।

–ডেভিড তুমি অ্যাশলের সঙ্গে দেখা করতে চাও?– ডেভিডের সম্বিৎ ফেরে। বলে,–হ্যাঁ।– ডাঃ প্যাটারসন ঘর থেকে বের হয়ে যান। –কেন কর্পোরেট লতে কাজ করা শুরু করলে–এই প্রশ্নটা ডেভিডের মনে ঘুরতে থাকে। কারণ ডেভিড একটা ভুল করেছিল। যার মূল্য হিসাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল ডেভিডের ভালবাসার নিরীহ নারীকে। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করে, ডেভিড আর কারও প্রাণের ভার নিজের ওপর নেবে না।

ইন্টারকমের বোতাম টিপে ডেভিড বলে–হোলি, কিনসেইডকে বলবে আমি এক্ষুনি ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।–ঠিক আছে।–

আধঘন্টা পরে ডেভিড জোসেফ কিনসেইনেউর অফিস ঘরে ঢোকে। প্রায় ষাট বছর বয়সের ধূসর রঙা পাকা চুলের সুপুরুষ ব্যক্তি। কিনসেড বলেন,–কী ব্যাপার ডেভিড তোমায় এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন? আমাদের তো পাঁচটায় দেখা হবার কথা ছিল।– ডেভিড বলে,–আমি অন্য ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ডাঃ প্যাটারসন এসেছিলেন আমার কাছে। উনি চান ওঁর মেয়ের হয়ে আমি আইনজীবী হিসাবে দাঁড়াই।– জোসেফ বলেন,–তুমি তো আপরাধ আইনজীবী নও।–আমি ওঁকে তা বলেছি।– জোসেফ বলেন,–কিন্তু ওনার মত ক্লায়েন্ট পাওয়া ভাগ্যের কথা। এমন প্রভাবশালী মানুষকে হাতে পেলে তা নানা ভাবেই কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আর খবরের কাগজগুলো যা প্রচার করবে তাতে আমাদের কোম্পানিরও প্রচার হবে। তুমি বরং ওনার মেয়ের সঙ্গে কথা বল। তারপর কোন সেরা অপরাধ আইনজীবীকে আমরা আমাদের কোম্পানির হয়ে নিয়োগ করব ওনার মেয়ের কেসটা লড়ার জন্য।–

–ধন্যবাদ জোসেফ। আমারও তেমনই ইচ্ছে।– ডেভিড বেরিয়ে এল জোসেফের চেম্বার থেকে। তার মনে একটাই প্রশ্নডাঃ প্যাটারসন অ্যাশলের উপযুক্ত আইনজীবী হিসাবে তাকেই বাছলেন কেন?

.

১২.

সান্তা ক্লারা জেলের সেলে অ্যাশলে বসেছিল। ও খুব বিহ্বল ছিল। তাই এই মুহূর্তে ওর কী করণীয় তা ভেবে দেখার মানসিকতা ওর নেই। জেলের এই কুঠুরিতে তার নিরাপদ মনে হচ্ছিল। যে তাকে অনুসরণ করছিল ও ঐসব ভয়ংকর কান্ড ঘটাচ্ছিল সে অন্তত জেলের ভেতর পোঁছোতে পারবে না। জেলের কুঠুরি যেন নিরাপত্তার উষ্ণ চাদর মনে হয় তার। তবে যে কারণে তাকে গ্রেফতার করা হল তার বিন্দুবিসর্গ জানে না সে। কেউ তাকে ফাঁসিয়েছে।

একজন পুলিশ কর্মী এসে বলল,–আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছেন।– দর্শনার্থীদের ঘরে এসে অ্যাশলে দেখল তার বাবা এসেছেন। মেয়েকে দেখে স্নেহ ও হতাশার এক মিশ্রিত অনুভূতি তার মুখে ফুটে উঠল। অ্যাশলেরও সারা শরীরে অপ্রতিরোধ্য আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে থাকে। কান্না চাপতে চাপতে বলে,–ওরা যে কারণে আমায় গ্রেফতার করেছে আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না।–

–জানি। আমি ডেভিড সিঙ্গার নামে একজন আইনজীবীকে তোমার হয়ে দাঁড়াতে বলেছি। সে শহরের অন্যতম সেরা উকিল। তুমি তাকে সব কথা খুলে বলবে।–আমি তাকে কী বলব বাবা? আমি তো কিছুই জানি না।–

জানি, কেউ তোমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমরাও এর শেষ দেখে ছাড়ব। তুমিই আমার সব কিছু।–আমারও তো তুমি ছাড়া কেউ নেই বাবা।–

সান জোস-এর দিকে যেতে যেতে ডেভিড সিঙ্গার ঠিক করে নেয় অ্যাশলেকে কী বলবে। অ্যাশলের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সে তার বন্ধু এদেশের অল্পবয়সী ক্রিমিনাল ল-ইয়ারদের অন্যতম সেরা জেসি কুইলারকে জানাবে। জেসিই পারবে অ্যাশলেকে সাহায্য করতে।

পুলিশের সদর দফতরে পৌঁছে ডেভিড প্রথমে শেরিফ ডাওলিং-এর সঙ্গে দেখা করে। বলে অ্যাশলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নিজের কার্ড দেখায়। শেরিফ একজন পুলিশকর্মীকে অ্যাশলের কাছে নিয়ে যেতে বলেন ডেভিডকে। দর্শনার্থীদের ঘরে পৌঁছে অ্যাশলের সঙ্গে দেখা হয়। অ্যাশলে এখন একজন আকর্ষণীয়া পূর্ণ যুবতী নারী। যদিও তার মুখ ফ্যাকাশে। –হ্যালো, আমি ডেভিড সিঙ্গার।–বাবা আমায় আপনার কথা বলেছেন।– ডেভিড চেয়ার টেনে বসে। উল্টো দিকের চেয়ারে অ্যাশলে বসার পর ডেভিড বলে,–আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।– অ্যাশলে সম্মতি জানায়। ডেভিড বলে,–প্রথমেই জানিয়ে রাখি আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হবে তা গোপন থাকবে। কিন্তু আমি সত্যিটা জানতে চাই।– ডেভিড বোঝে ওকে আরও স্পষ্ট হতে হবে। যাতে জেসির হাতে কিছু তথ্য তুলে দিতে পারে।

অ্যাশলে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। ডেভিড একটু ইতস্তত করে বলে,–আপনি কি ঐ পুরুষদের খুন করেছেন?– আর্ত চিৎকারের মত করে অ্যাশলে বলে,–আমি কিছু জানি না এ ব্যাপারে।– ডেভিড তার পকেট থেকে লম্বা কাগজ বের করে বলে,–জিম ক্লেয়ারির সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা ছিল?–

–হ্যাঁ আমরা বিয়ে করব বলে ঠিক করেছিলাম। আমি ওকে খুন করব কেন?

— ডেভিড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করে,–আর ডেনিস টিব্বলের ব্যাপারটা?–

–ডেনিস আর আমি একই অফিসে চাকরি করতাম। যে রাতে সে খুন হয় সেদিন তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল কিন্তু আমি তার খুনের ব্যাপারে কিছু জানি না। তাছাড়া সেই সময় আমি শিকাগোতে ছিলাম।– ডেভিড অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পরখ করে অ্যাশলের কথায় কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে। অ্যাশলেও বোধহয় সেটা বুঝতে পারে। বলে,–আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন। ডেনিসকে বিনা কারণে কেন খুন করব আমি?– ডেভিড বলে,–তা তো ঠিকই।– এবার কাগজের টুকরো দেখে বলে,–জঁ ক্লদ পেরেতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?–সম্পর্ক?– অ্যাশলে তাকে থামিয়ে দেয়। বলে,–পুলিশের কাছেই আমি প্রথম ওনার নাম জানতে পারি।– ডেভিড বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করে,–আর রিচার্ড মেলটন?–একই ব্যাপার। ওনাকে কখনও দেখিনি। পুলিশ ভুল করছে। আপনি বিশ্বাস করুন।–

ডেভিড ভাবে ওর উত্তরগুলো আপাতভাবে অবিশ্বাস্য। কিন্তু যেভাবে দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলছে তা পাকা অভিনেত্রী না হলে সম্ভব নয়। অ্যাশলে তো অভিনেত্রীও নয়। ডেভিড আবার কাগজের টুকরোয় চোখ রেখে বলে,–আর স্যাম ব্লেক?– অ্যাশলে বলে–উনি আমার ফ্ল্যাটে খুন হবার রাতে ছিলেন। কিন্তু আমি শোবার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন ভোরে চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙে। জানতে পারি আমার বাড়ির পেছনের গলিতে ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। উনি তো আমার নিরাপত্তার জন্যই আমার ফ্ল্যাটে ছিলেন। ওঁকে খুন করে আমার কী লাভ?—

ডেভিড অ্যাশলের কথা মনোযোগ দিয়ে ভাবে। যুক্তিসঙ্গত কথা। কোথাও একটা বাধা রয়েছে। বলে,–আজ আমি চলি। আবার আসব।–

শেরিফের ঘরে এসে বলে,–আপনারা একটা বিরাট কাঁচা কাজ করেছেন। আদালতে এই কেস তো দাঁড় করাতেই পারবেন না। পুলিশের ভেবে দেখা উচিত ছিল যাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের দুজনকে অ্যাশলে দেখেই নি কখনও।–

শেরিফ কয়েক মুহূর্ত ডেভিডের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর সশব্দ হাসিতে ফেঠে পড়ে বলেন–মেয়েটা আপনাকেও বোকা বানিয়েছে তো? অবশ্য আমাদেরও প্রচুর। নাস্তানাবুদ করেছে।– ডেভিড বলে,–আপনি কী বলতে চাইছেন?– ডাওলিং টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ থেকে খুঁজে পেতে একটা ফাইল বার করে ডেভিডকে দিয়ে বললেন, এতে সব প্রমাণ পেয়ে যাবেন। পাঁচজন পুরুষকে ছিন্নভিন্ন করে লিঙ্গচ্ছেদ করে খুন করা হয়েছে–এফ বি আই তদন্তের ফলাফল, ডি. এন. এ. পরীক্ষার ফলাফল, ইন্টারপোলের গোয়েন্দা দফতরের তদন্তের ফলাফল এবং ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফল

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সব একই। খুন হওয়া প্রতিটি পুরুষই যৌনমিলন করেছিলেন। যোনিরস, নারীর যৌনকেশ, হাতের আঙুলের ছাপ সব একজন নারীর। সে হচ্ছে অ্যাশলে প্যাটারসন।– ।

ডেভিড অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে,–আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে না তো?– শেরিফ বলেন,–না, পাঁচজন আলাদা করোনার দিয়ে আলাদাভাবে ঐসব মৃতদেহ পরীক্ষা করানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সবার এক। অ্যাশলেই যে খুনি তাকে কি এরপরও কোন সন্দেহ থাকা চলে?– ডেভিড অসহায়ভাবে তাকায়। শেরিফ আরও বলেন,–স্যার ব্লেক আমার বোনের স্বামী, তাই ব্যক্তিগতভাবেও আমি কেসটার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি। অ্যাশলের বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জ আনা হচ্ছে। ওর চরম সাজা চাই আমি।– ডেভিড বলে,–আমি আর একবার অ্যাশলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।–বেশ যান।– অনিচ্ছার সঙ্গে বলেন শেরিফ।

ডেভিড দর্শনার্থীদের ঘরে এলে অ্যাশলেকে নিয়ে আসা হয়। ওকে দেখে রাগত গলায়, ডেভিড বলে,–কেন তুমি আমায় মিথ্যে বললে?– অ্যাশলে বলে, আমি সত্যিই নির্দোষ।– ডেভিড বলে,–তোমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তোমার কাছে সত্যি কথাটা আমি জানতে চেয়েছিলাম।– অ্যাশলে ঠান্ডা গলায় কঠিন মুখে বলে–আমি মিথ্যে বলিনি।– ডেভিড ভাবে ওকি সত্যিই বিশ্বাস করে ও যা বলছে তা সত্যি? তাহলে ও কি পাগল? জেসিকে তাহলে কী বলব?

সানফ্রান্সিসকোয় ফেরার পথে ডেভিডের মাথায় একটা চিন্তা আসে। অ্যাশলে যদি সত্যিই পাগল হয় তাহলে জেসির কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। আদালতে যদি প্রমাণ করা

যায় অ্যাশলে মানসিকভাবে অসুস্থ, তবেই শাস্তি এড়ানো যাবে এবং মানসিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারবে।

ডেভিড অফিসে ফিরেই জোসেফ কিনসেইডের ঘরে গিয়ে হাজির হল। ওকে বলে,– এসো, এসো ডেভিড। অফিস ছুটি হলেও আমি তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। ডাঃ প্যাটারসনের মেয়ের সঙ্গে কথা হল?– ডেভিড সম্মতি সূচক মাথা নাড়ে। –তাহলে তুমি কি ডাঃ প্যাটাসনের মেয়ের পক্ষে লড়ার জন্য কোন উকিল ঠিক করেছ?–না, কাল আমি আরও একবার অ্যাশলের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তারপর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবব।–ঠিক আছে। যেভাবে এগোতে চাইছ তাই এগোও।– ডেভিডের প্রত্যাশা ভেঙে যায়। পার্টনারশিপ বিষয়ে কোম্পানি কিছুই বলেন না।

ডাঃ রয়েস সালেম-এর সঙ্গে যোগাযোগটা জেসি কুইললারই করিয়ে দেয়। উনি জেসির আইন সংস্থারই মনস্তত্ত্ববিদ। রোগা, লম্বা, মুখে অনেকটা সিগমন্ড ফ্রয়েডের আদলের দাড়ি। ডাঃ সালেম বলেন,–প্যাটারসনের কেসটা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং এবং মনস্তাত্ত্বিক তো বটেই। আপনি কি মনস্তাত্ত্বিক রোগীর প্রেক্ষিতে আবেদন করতে চান?– ডেভিড বলে– আমি কোন ক্রিমিনাল ল-ইয়ারকে এই কেস-এর দায়িত্ব দেবার আগে প্যাটারসনের মানসিক অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করে নিতে চাই।– এরপর ডেভিড তার সঙ্গে অ্যাশলের কথাবার্তা ও শেরিফের সঙ্গে কথাবার্তা বর্ণনা করে। ডাঃ সালেম গভীর মনোযোগ দিয়ে ডেভিডের সব কথা শুনছিলেন। বললেন,–আমার প্রথম কাজ হবে মিস প্যাটারসনের মানসিক অবস্থাটা যাচাই করে দেখা।–

সান্তা ক্লারা জেলের অপরাধীকে জেরা করবার ঘরেই হিপনোথেরাপি শুরু হল। মুখোমুখি দুটো চেয়ারে অ্যাশলে আর ডাঃ রয়েস সালেম বসে আছেন। ডাক্তারের পাশের চেয়ারে ডেভিড। অ্যাশলেকে বিবর্ণ ও প্রাণহীন দেখায়। –মিস প্যাটারসন আপনার হিপনোথেরাপিতে কোন অসুবিধা নেই তো?– ডাঃ সালেম জিজ্ঞেস করেন। অ্যাশলে উত্তর দেয় না। যেন ঘটনাপ্রবাহে ভেসে যেতে তৈরি সে। ডাঃ সালেম বলেন, স্তাহলে আমরা কাজ শুরু করি?– ডেভিড বাইরে যেতে চায়। ডাঃ সালেম বাধা দেন। ডেভিড ভাবে না চাইলেও কেসটার সঙ্গে ও বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সে কোম্পানির অংশীদারের বিষয়টা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাইছে জোসেফ-এর সঙ্গে। এদিকে ডাঃ সালেমের কাজ শুরু হয়ে গেছে। –এর আগে কি আপনি কখনো সম্মোহিত হয়েছেন?–না।–আপনি মনটাকে একেবারে চিন্তাশূন্য করে দিন। আর গভীরভাবে আমার কথাগুলো উপলব্ধি করতে থাকুন। ক্রমশ আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আর কিছু করতে হবে না আপনাকে।– অ্যাশলে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ডাঃ সালেম চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে অ্যাশলেকে রিল্যাক্স ভঙ্গিতে বসিয়ে দেয়। বলে–আপনি ভীষণ ক্লান্ত...ঘুম পাচ্ছে আপনার...গভীর ঘুম...ঘুম...ঘুমিয়ে পড়ুন মিস প্যাটারসন..ঘুমিয়ে পড়ুন।– ডেভিড অবাক হয়ে দেখে অ্যাশলের মুখে ঘুমের আবেগ ছড়িয়েছে। একসময় চোখ বুজে আসে। ঘুমিয়ে পড়ে সে। মাত্র দশ মিনিটের ভেতর পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে যায়।

অ্যাশলে ঘুমিয়ে পড়তেই ডাঃ সালেম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। অ্যাশলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন,–মিস প্যাটারসন, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?– কয়েক সেকেন্ড পরে ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হল অ্যাশলের। বলল,–পাচ্ছি।– যেন বহুদূর থেকে কেউ কথা বলছে। –আপনি কোথায়?–জেলে।–কেন?–সবাই ভাবছে আমি খুনি,–সেটা কি সত্যি?–না, আমি

খুনি নই।–আমি খুনি নই।– ডেভিড বিস্ফারিত চোখে ডাঃ সালেমের দিকে তাকায়। মানুষ সম্মোহিত অবস্থাতেও কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? ডাঃ সালেম প্রশ্ন করে,– আপনার কি কোন ধারণা আছে কে এই খুনগুলো করেছে?– প্রশ্নটা শুনেই সম্মোহিত অ্যাশলের মুখচোখের চেহারা বদলে যায়। ওর ব্যাক্তিত্ব যেন বদলে যেতে থাকে। মুখে এক সুতীব্র উন্মাদনা, প্রাণময়তা ভেসে উঠতে থাকে। উজ্জ্বল, ঝকমকে চোখে সে সুরেলা গলায় অচেনা বাকভঙ্গিতে গান পেয়ে ওঠে

–হাফ এ পেনি অব টিউপেনি রাইস
হাফ এ পাউন্ড অব ট্রিকলে,
মিক্সড ইট আপ, মেক ইট নাইস
পপ! গোজ দ্য ওয়েসেল—

ডেভিড ভাবে কাকে বোকা বানাতে চাইছে অ্যাশলে? ডাঃ সালেম কিন্তু অবাক হননি। তিনি বলেন,–আমি আপনাকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।– অ্যাশলে ইংল্যান্ডবাসীদের ভঙ্গিতে চুল ঝাঁকিয়ে বলে,–আমি অ্যাশলে নই। টোনি প্রেসকট।– ডেভিড ভাবে পাকা অভিনেত্রী। ডাঃ সালেম সম্মতির ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়েন। বলেন,–টেনি আমি জানতে চাই...– ডাক্তারকে থামিয়ে টোনি বা অ্যাশলে বলে ওঠে,–আপনি কি আমায় এই বিশ্রী জেলখানা থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারবেন?–সেটা নির্ভর করছে আপনি এই ঘটনা সম্পর্কে কতখানি কি জানাতে পারবেন।– মেয়েটি কৌতুকের গলায় ইংরেজ উচ্চারণভঙ্গির উচ্চারণে বলে,–ঐ খুনগুলো? যার জন্য বাপ সোহাগি মেয়ে এখানে আটক রয়েছে? হ্যাঁ, আমি সে ব্যাপারে অনেক কিছুই...—

তক্ষুনি অ্যাশলের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। গোটা শরীরটা কাঁপছে। সতেজ, টানটান ভাবটা উধাও। কুঁচকে যাচ্ছে দেহটা। শরীরের আক্রমণাত্মক ভাবটাও সহজ হয়ে যায়। –টোনি,– ডাকেন ডাঃ সালেম। –দুঃখিত ডাঃ সালেম। আমি টোনি নই। অলিটটে পিটার্স।– ইতালিয় ঘরানার উচ্চারণ। ভেভিড বিস্ফারিত চোখে ডাঃ সালেম-এর দিকে তাকায়। ডাঃ সালেম চাপা স্বরে বলেন,–ওরা অলটার ইগো। আমি পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলব।– এবার অ্যাশলেকে বলেন–অ্যাশলে, ইয়ে...মানে...আলিটটে আপনারা মোট কতজন এখানে আছেন?– মৃদু ইতালিয় উচ্চারণে কথা ভেসে আসে...–মোট তিনজন। আমি, অ্যাশলে, টোনি।–আপনি কি ইতালিয়!–হ্যাঁ, রোমে আমার জন্ম।–আপনি টোনি প্রেসকটকে চেনেন?–Si naturalmete; ওর ইংরেজি উচ্চারণ বৃটিশ ঘেঁষা কারণ ওর জন্ম লন্ডনে। ও ইংরেজ।–অলিটটে খুনের বিষয়ে তুমি কি কিছু জান?– এবার মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। ওরা বোঝে এটা টোনি প্রেসকট। সে বলে,– অলিটটে কিছু জানে না খুনের বিষয়ে। আমি জানি। কিন্তু কেন বলব? বড়লোক বাবার মেয়ে আমার আর অলিটটের জন্য কী করেছে? আমরা যাতে কোন মজা, আনন্দ, সুখ, খুশি পাই সেই চেষ্টা করেছে। আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত। ঐ মেয়েটা আমাদের সারারাত ঘুমোতে দেয়নি।–

অ্যাশলের বা টোনির মুখে তীব্র ঘৃণা। ডাঃ সালেম ডেভিডকে বলেন,–আজ এই অবধিই থাক। ওকে ফিরিয়ে আনি।– ডেভিড সায় দেয়। ওর নিজেরও এই পরিবেশ অসহ্য লাগছিল। ডাঃ সালেম অ্যাশলের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন,–অ্যাশলে...জেগে ওঠো...1.জেগে ওঠো... তোমার মন শান্ত...জেগে ওঠো...জেগে ওঠো।– অ্যাশলে বার কতক কেঁপে ওঠে। শরীরটায় প্রাণের স্পন্দন। দুচোখ মেলে তাকায়। বলে,–আমার কি হয়েছিল? আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?– ডাঃ সালেম বলেন,–আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে

দিয়েছিলাম।– অ্যাশলে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়,–আপনাকে কোন সাহায্য করতে পেরেছি কি?–হ্যাঁ। ধন্যবাদ। এখন বিশ্রাম নাও।– ওয়ার্ডেন ঘরে আসে। অ্যাশলে বেরিয়ে যায়।

ডাঃ সালেমের অফিসে ডেভিড বসেছিল, বলল,–আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।–ডাঃ সালেম বলেন,–এটা হল মালটিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। মানে ব্যক্তিত্বের বহুমুখী প্রকাশ। একই মানুষের শরীরে, মানসিকতায়, প্রবৃত্তিতে একই সঙ্গে বহু সত্তার প্রকাশ ঘটে। একে ডিসোগিয়েটিড আইডেনটিটি ডিসঅর্ডারও বলে। সাধারণতঃ শৈশবের ট্রমা থেকে এর সৃষ্টি। মানুষটি তার ব্যক্তিত্বের আসল সত্তাটির দরজা বন্ধ করে নিজেকে অন্য কেউ ভাবতে থাকে। যেমন অ্যাশলে নিজেকে কখনও অলিটটে পিটার্স, কখন টোনি প্রেসকট ভাবতে শুরু করছে।– ডেভিড জানতে চায়,–এই আলাদা চরিত্রগুলো একে অন্যের কথা জানতে পারে?–কখনও পারে, কখনও পারে না। এখানে অবশ্য টোনি, অলিটটে, অ্যাশলে সবাই অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত। শৈশবকালীন ট্রমার অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এই অলটার ইগোর জন্ম হয়। এটা এক ধরনের পলায়ন পরায়ণতা। এই অসুখের কেস হিস্ট্রি দেখলে দেখা যাবে ঐ অলটার ইগোগুলি চরিত্রে, মানসিকতায়, ব্যক্তিত্বে একে অন্যের থেকে আলাদা। একটি সহজ সরল হলে অন্যটি হিংস্র, কূট, খল হয়ে থাকে। বাকভঙ্গিও আলাদা হয়।–কিন্তু অ্যাশলেকেও তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হল।– ডেভিড বলে। ডাঃ সালেম বলেন,–এই রোগীদের এমনই মনে হয়। যতক্ষণ না অন্য সত্তাটি মূল আসল চরিত্রটিকে গ্রহণ করে নিচ্ছে ততক্ষণ রোগী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় সত্তাটি নিজের অধিকার কায়েম করলে আসল ব্যক্তিত্ব সত্ত্বাটিকে নিজের অধিকারে রাখতে পারে। সেই সময়টায় আসল সত্তাটির মন পুরো অবচেতনে ডুবে থাকে। ঐ সময় পরিবর্তিত সত্তাটি কি করছে তা সে জানতে বা

বুঝতে পারে না। এই ধরণের বহুমুখী ব্যক্তিসত্তার কথা প্রথম জানা যায় ব্রাইভি মারফির কেসটার সমাধান করতে গিয়ে। প্রতি এক লাখে একজন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত।– ডেভিড বলে,–এ তো আবিশ্বাস্য।– ডাঃ সালেম হাসেন। বলেন,–এই যে পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বগুলো এগুলো কিন্তু প্রতিটি মানুষের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। মূল সত্তার ব্যক্তিত্বের আড়ালে তারা চাপা থাকে। কখনও কখনও এই প্রচ্ছন্ন, সত্তা আত্মপ্রকাশ করে। খুব নরম মনের মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইডের ঘটনা বাস্তবেও ঘটে।–

ডেভিড জানতে চায়–তাহলে কি খুনগুলো অ্যাশলেই করেছে?–হ্যাঁ, কিন্তু ও তার সম্পর্কে কিছুই জানে না।– ডেভিড বলে,–কিন্তু আদালতে আমি কীভাবে ব্যাখা করব? প্রমাণই বা করব কী করে?– ডাঃ রয়েস বলেন,–এই যে বললেন আপনি এই কেসটা নিচ্ছেন না?– হ্যাঁ...তাই..মানে...আচ্ছা এই অসুখ কি সারে?– অবশ্যই।–আর যদি না সারে?–অন্তিম পরিণতি সাধারণতঃ আত্মহত্যা।–অ্যাশলেকে কি আপনি এই ব্যাপারটা বলবেন?– া।– অ্যাশলে চিৎকার করে ওঠে–না–এক তীব্র আতঙ্ক ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে। –এসব সত্যি না।– ডাঃ সালেম বলেন–এটা বাস্তব। তবে এতে তো তোমার কোন হাত নেই। তোমাকে কেউ দায়ী করবে না খুনি হিসাবে।– ওকে সিডেটিভ দিয়ে তিনি চলে যান।

ডাঃ প্যাটারসন ডেভিডের অপেক্ষায় ছিলেন, ডেভিড যেতেই জানতে চান–অ্যাশলে ঠিক আছে তো?–আপনি মালটিপল পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার বিষয়ে জানেন?–কিছুটা জানি, এমন এক মানসিক অসুখ যাতে একজন ব্যক্তির মধ্যে অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাজ করে। মূল ব্যক্তিত্ব সময়, ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকেন।–আপনার মেয়ে এই মনোরাগের শিকার।–আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।– ডাঃ প্যাটারসন

হতবাক। হয়ে যান। ডাঃ প্যাটারসনকে ডেভিড সব ঘটনা খুলে বলে। গভীর বেদনায় তার মন ভরে যায়। –সত্যিই অ্যাশলে খুনগুলো করেছে?– মুষড়ে পড়া ডাঃ প্যাটারসনকে ডেভিড বলে,–আপনি ভেঙে পড়বেন না। আইনের চোখে অ্যাশলে অপরাধী হবে না। যা করেছে অবচেতনে থাকা অবস্থায় করেছে। খুনগুলো করার পেছনে কোন ব্যক্তিগত কারণ ছিল না।–

–বিপক্ষকে ঐ খুনের পেছনের মোটিভ খুঁজে বের করতে হবে যা খুব কঠিন। তবে আদালতে আগে প্রমাণ করতে হবে যে অ্যাশলে মনোরোগের শিকার।– ডাঃ প্যাটারসন বলেন,–তার মানে অ্যাশলের এই অসুখটাই তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রধান অস্ত্র হবে?– ডেভিড বলে,–আমি এই কেসটা নিচ্ছি না, আমার এক উকিল বন্ধুকে ঠিক করেছি। সে...– ডাঃ প্যাটারসন কঠিন স্বরে বলেন,–তোমাকেই এই কেসটা নিতে হবে।– তার মুখের চেহারাই বলে দিচ্ছিল খুব চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করছেন তিনি। বললেন,–সেই দিনটার কথা মনে আছে ডেভিড? যেদিন তোমার মাকে আমি বাঁচিয়ে ছিলাম। তোমার মা ছিলেন তোমার সব কিছু। আমার মেয়েও তেমনি আমার সব কিছু।তুমি আমার কাছে ঋণী তা ভুলে যেও না।– ডেভিড কিছু বলতে যায়। ডাঃ প্যাটারসন তাকে থামিয়ে দেন।

.

১৩.

ডেভিড বাড়ি ফিরে সান্দ্রাকে দেখে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। সান্দ্রা এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। বলে,–তোমায় খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?–কাজের চাপ।– সান্দ্রা বলে–মিঃ ক্রোটহার এসেছিলেন উনি বললেন কাগজপত্র তৈরি। আমরা কবে টাকা দিতে আর সই সাবুদ করতে যেতে পারব জানতে চাইলেন।– নিমেষে ডেভিড বাস্তবের মাটিতে ফিরে এল, এখন কী করবে ডেভিড? কোম্পানির অংশীদারিত্ব পাওয়াটাকে তো ফেলে দেওয়া যায় না। এত বছরের পরিশ্রম তো সেই জন্যই। সান্দ্রা তাকে ডাকে-একগোছা কাগজ নিয়ে আসে। বলে,–দেওয়ালের রঙের শেড কার্ড। আমাকে একটু রং পছন্দ করতে সাহার্য্য করবে? ওরকম জায়গায় সুন্দর একটা ফ্ল্যাট যে আমাদের হবে তা বিশ্বাসই হচ্ছে না।–

ডেভিড দোটানায় পড়ে। কী করবে সে এখন? সান্দ্রার খুশির স্বপ্ন, তাদের সন্তান, তার ভবিষ্যৎ এগুলো না কি ডাঃ প্যাটারসনের কাছে ঋণমুক্ত হওয়া কোনটা বেশি জরুরি? সান্দ্রা ডেভিডকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল। এবার বিছানা ছেড়ে এসে দাঁড়ায়। ডেভিড ভাবে আর দেরি করা উচিত নয়। সান্দ্রাকে সব বলা উচিত। সে সান্দ্রার হাত ধরে বিছানায় নিয়ে যায়। তারপর পুরে ব্যাপারটা বলে। সান্দ্রা সব শুনে বলে,–তাহলে তুমি এখন কী করবে?– ডেভিড বলে,–আমি বুঝতে পারছি না। কিনসেইড প্রথমে উৎসাহ দেখালেও এখন ভাবছে হার প্রায় নিশ্চিত এরকম কেস আমি না নিলেই ভাল। এই কেসটা আমি নিলে কোম্পানির অংশীদারী তো হবেই না।– সান্দ্রা বলে,–তাহলে?– ডেভিড বলে,–আমার সামনে দুটো পথ রয়েছে। ডাঃ প্যাটারসনের কাছে করা শপথ ভুলে গিয়ে ফার্মের অংশীদারী হওয়া। অথবা অ্যাশলের কেসটা লড়া। তবে আমি বুঝতে পারছি না ডাঃ প্যাটারসন কেন শুধু আমাকেই এই কেসটা নিতে বলছেন।– সান্দ্রা সব শুনে মুখ খোলে। বলে,–উনি পৃথিবীর অন্যতম নামী ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও তোমার মায়ের

অপারেশন। করেছিলেন বিনা পয়সায়। এই মহান মানুষের প্রয়োজনে আজ তোমার তার পাশে দাঁড়ানো। উচিত। আমাদের কাঁপালে যদি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকে সবই হবে।–

জেসি কুইলার দেশের অন্যতম সেরা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার যে অল্প বয়সেই খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেছে। তার সঙ্গে ডেভিডের গাঢ় বন্ধুত্ব। তার বাড়ির বসার ঘরে বসেছিল। জেসি বলে, তাহলে তুমি এই কেসটা নিচ্ছ?–আমি দ্বিধাগ্রস্ত।–কিন্তু কেন? ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে তোমার মোগ্যতা তো প্রশ্নের অতীত। এগিয়ে যাও। মৃত অতীতকে আঁকড়ে থেক না। যা ঘটে গেছে সেটা একটা দুর্ঘটনা।–

কথাটা শুনেই ডেভিডের মন অতীতে চলে যায়। হেলেন উডম্যান। একজন সুন্দরী যুবতী। নিজের ধনী সম্মাকে খুনের দায়ে যে অভিযুক্ত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, ডেভিড এই মামলাটার দায়িত্ব পেয়ে একদিন জেলে হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিশ্চিত হয় সে নির্দোষ। বারবারই মামলার কাজে হেলেনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হত। আর একটু একটু করে তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।

ডেভিডের টুকরো টুকরো তথ্য মামলাকে হেলেনের পক্ষেই নিয়ে যাচ্ছিল। হেলেনের পক্ষে জোরদার অ্যালিবাই (নির্দোষিতার সপক্ষে যুক্তি) ছিল যে ঘটনার সময় হেলেন নাটক দেখছিল তার এক বন্ধুর সঙ্গে। কিন্ত সাক্ষ্য দিতে এসে বন্ধুটি বলে যে খুনের সময় সে হেলেনকে তার সৎমায়ের অ্যাপার্টমেন্টে উপস্থিত থাকতে দেখেছিল। বিচারক হেলেনকে প্রাণদণ্ড দেয়।

ঘটনাটায় ডেভিড খুব ভেঙে পড়ে। দণ্ডদানের পরের দিন ডেভিড হেলেনের সঙ্গে দেখা করে। বলে,–কেন তুমি আমায় মিথ্যে বললে?– হেলেন বলে,–আমি সম্মায়ের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু গিয়ে দেখি সে মারা গেছে। জানতাম এ কথা তোমরা বিশ্বাস করবে না তাই। থিয়েটার দেখার কথাটা বানাতে হয়েছিল।– ডেভিড বলে তোমার মিথ্যে কথায় ভুলে আমাকে আদালতে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে। এখন আবার নতুন মিথ্যে গল্প ফাঁদছ। হেলেন কোনো প্রতিবাদ করে না। শুধু ওর মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে। ডেভিড ঘৃণার চোখে হেলেনের দিকে তাকিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে ফিরে আসে। পরের দিনই জানতে পারে সেদিনই রাতে নিজের পোশাক ছিঁড়ে দড়ি বানিয়ে তাতে ফাস বানিয়ে আত্মহত্যা করেছে হেলেন। তাতেও ডেভিড বিশেষ ভেঙে পড়েনি। কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পর পুলিশের এক ডাকাতির তদন্তে ধরা পড়ে এক কুখ্যাত অপরাধী। সে স্বীকার করে হেলেনের সৎ মায়ের ফ্ল্যাটে ডাকাতি করতে গিয়ে সে মহিলাকে খুন করেছিল। ডেভিড এই ঘটনায় প্রচণ্ড ভেঙে পড়ে। পরদিনই সে জেসি কুইললারের কাছে জানায় সে ফার্ম ছেড়ে দিচ্ছে। এর দুসপ্তাহ পরে টার্নার, বোস অ্যান্ড রিপলি ফার্মে যোগ দেয়। এবং শপথ নেয়,–কোন মানুষের প্রাণের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবে না।–

.

১৪.

পরের দিন সকালে জোসেফ কিনসেইডের সঙ্গে দেখা করে পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে তাকে জানাল ডেভিড। কিনস্লেইড তাকে বিনা বেতনে ছুটি দিতে রাজি হল। সে এবার ডাঃ প্যাটারসনের অফিসে গেল। তাকে তার সম্মতি জানাল। ডাঃ

প্যাটারসন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন মামলা চলাকালীন তার সংসারের খরচ বহন করবেন তিনি। ডেভিডের আপত্তি টিকল না।

জেসি কুইললার সোজা চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে। বলে,–তাহলে ডেভিড এই শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিস্ফোরক মামলায় তুমি অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়াচ্ছ। কিন্তু ভেবে দেখেছ কি তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য লোকবল বা যন্ত্রপাতি নেই। ফ্যাক্স নেই, জেরক্স নেই, আদ্যিকালের একটা কমপিউটার আছে শুধু। তুমি আমার অফিসের খালি চেম্বারগুলোর একটায় কাজ শুরু কর।–না জেসি তা হয় না।–হয় ডেভিড, পরে না হয়, শোধ করে দিও।–বেশ, তবে তোমার বুদ্ধি, কৌশল, পরামর্শ আমার খুব দরকার এই মামলায়।–তা তুমি সবসময়ই পাবে।–ধন্যবাদ জানিয়ে তোমার বন্ধুত্বকে ছোট করব না।– জেসির হাত চেপে ধরে বলে ডেভিড।

পরের দিন অ্যাশলের সঙ্গে জেলে দেখা করতে গেল ডেভিড। ওকে আরও প্রাণহীন দেখাচ্ছে। –সুপ্রভাত অ্যাশলে।–সুপ্রভাত।– যান্ত্রিক গলায় বলে অ্যাশলে। বলে,–সকালে বাবা বললেন আপনি আমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবেন।– ডেভিড বলে,–যা, আসলে সমস্যা হল তোমার অসুখটার ব্যাপারে শতকরা ৯০ জন মানুষই জানে না। তাই আদালতে উপযুক্ত প্রমাণ সহ ব্যাপারটা উপস্থাপিত করা বেশ কঠিন।–আমার খুব ভয় করছে– অ্যাশলে বলে,–দুটো অন্য অচেনা সত্তা আমার মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে জানতে পেরে খুব ভয় করছে। ওরা কখন কী করে বসে।–ভয়ের কিছু নেই। ওরা তো তোমারই মনের অংশই। সঠিক চিকিৎসায় তুমি সেরে উঠবে।–

পরদিন ডেভিড জেসির অফিসে হাজির হল। ডেভিডের চেম্বার সাজিয়ে রেখেছে সে। সেখানে নিয়ে গেল ডেভিডকে। ডেভিড বলে,–আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না,– জেসি হাসে। একটু পরে সান্দ্রা আসে। জেসি অবাক হয়। সান্দ্রা বলে,–আমি বিয়ের আগে ল-ফার্মের কর্মী ছিলাম। আমি ডেভিডের সহকারী হিসাবে কাজ করব।–

কাজ শুরু হয়। সান্দ্রা বলে,–কী ভাবে শুরু হবে?–আমাদের কাজ হবে ইন্টারনেট ঘেঁটে এই ধরনের রোগের কেসগুলোর কেস হিস্ট্রি খুঁটিয়ে দেখা। দুপক্ষের আইনজীবীদের পুরো মামলার জেরার পুরো বিবরণ খুঁটিয়ে পড়া। উকিল ও সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলতেও হতে পারে। সরকার পক্ষ যে সব সাক্ষীদের কাঠগড়ায় তুলবে তাদের কীভাবে জেরা করা হবে তাও স্থির করতে হবে। খুব কঠিন মামলা হবে এটা।– সান্দ্রা বলে,–কিন্তু তুমিই জিতবে, দেখো।–

ঠিক ছিল দক্ষিণ সান জোসের সুপিরিয়র কোর্টে মামলাটা উঠবে। কিন্তু যেহেতু খুনগুলো আলাদা শহরে ঘটেছিল তাই তিন দেশের পুলিশই তাদের শহরে মামলা করার আবেদন জানালো। গাই কনটেইন বললেন,–আমরা মামলাটা কুইবেক সিটি কোর্টে তুলতে চাই কারণ খুনের যে তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে তাতে সহজেই খুনিকে সাজা দেওয়া যাবে।–

প্রতিবাদ জানান সানফ্রান্সিসকোর পুলিশ ক্যাপ্টেন রাডফোর্ড। তিনি বলেন,–আমাদের শহরে আসামি তিনটি খুন করেছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলেন আমাদের শহরেই মামলা হওয়া উচিত গুরুত্বের বিচারে।–

বডফোর্ড শহরের পুলিশ গোয়েন্দা ইগান বলেন,–জিম ক্লেয়ারি খুনের ঘটনা যেহেতু দশ বছরের পুরনো এবং আমাদের শহরে ঘটেছিল তাই আমাদের শহরে মামলা শুরু হওয়া উচিত।– সান্তা ক্লারা পুলিশের শেরিফ ডাওলিং বললে,–দুদুটো খুন আমাদের শহরে ঘটেছে। সেখানে আসামি গ্রেফতার হয়ে আমাদের হেফাজতেই আছে তাই আমাদের শহরেই মামলা হোক।–

আরও প্রায় আধঘণ্টা বাদানুবাদের শেষে শেরিফ ডাওলিংয়েরই জিত হল। ডেনিস টিব্বলে, রিচার্ড মেলটন এবং স্যাম ব্লেকের খুনের মামলা আপাতত চলবে। কুইবেক এবং বেডফোর্ডের মামলা দুটো মুলতুবি থাকবে।

নির্দিষ্ট দিনে সান জোসের আদালতে মামলা উঠল। বিচারপতি বলেন,–আসামী পক্ষ মামলার কী আবেদন রাখছেন?– ডেভিড উঠে বলে,–মহামান্য বিচারপতি, আমার মক্কেল নির্দোষ। সে এক জটিল মানসিক অসুখে আক্রান্ত, তাই আমি তার জামিনের আবেদন রাখছি।– ডেভিডের কথা শেষ হতেই সরকারী উকিল বললেন,–মাননীয় বিচারপতি, আমি এর বিরোধিতা করছি। আসামি তিনটি খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত। প্রাণদণ্ডই প্রাপ্য তার। তাকে জামিন দিলে সে দেশ ছেড়ে পালাবে।– বিচারপতি বললেন,–আসামির জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হল।– ডেভিড দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে,–তাই হবে মহামান্য আদালত।–

সেদিন বাড়ি ফিরতে সান্দ্রা বলে,–খবরের কাগজগুলো দেখেছ? বুচার বিচ নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাশলেকে। সব কাগজ আর টিভি চ্যানেলগুলো অ্যাশলের বিপক্ষে লিখছে।–এ তো জানাই ছিল। সবাই বিপক্ষে থাকবে। তাদের নিয়েই আমাদের লড়তে হবে।–

পরের আট সপ্তাহ খুব ঘটনাবহুল ভাবে কাটল। রাত জেগে ডেভিড আর সান্দ্রা ইন্টারনেট থেকে গত শবছরে আমেরিকায় ঘটা মালটিপল পারসোনালিটি ডিজ অর্ডারের কেসগুলোর মামলাগুলো খুঁটিয়ে দেখে। খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, চুরি, মাদক ব্যবসা বিভিন্ন ধরনের অপরাধে প্রচুর অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থন রয়েছে। সান্দ্রা ঐ সব মামলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নাম ঠিকানা একত্র করে ফোনে যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গে। –হালো, ডাঃ নাকাসোতো? আমি ডেভিড সিঙ্গারের সহকারী বলছি। অরিগন জেলা বনাম বোহনান মামলায় আপনি সাক্ষী ছিলেন। ডাক্তারবাবু, অ্যাশলে প্যাটারসন মামলায় আপনার সাক্ষ্য। গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আপনাকে সাক্ষী হিসাবে পেতে চাই।–

হ্যালো, ডাঃ বুথ? আমি অ্যাশলে প্যাটারসন মামলায় আসামী পক্ষের উকিল ডেভিড সিঙ্গারের অফিস থেকে বলছি...–হ্যালো, ডাঃ জেমসন?...– সকাল থেকে রাত অবধি একটা লম্বা তালিকা তৈরি হল সাক্ষীদের। ডেভিড খুশির গলায় বলল–তালিকাটা ভালই। দুজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ একজন ডিন, আইন কলেজের প্রধান।–

সোমবার সকালে জেসি কুইললারের অফিসের ঠিকানায় একটা বাদামি মোেটা খাম এল। তাতে এক গোছা কাগজ, ডেভিড চিঠিটা পড়ে হতাশ হল। সান্দ্রা উৎসুক চোখে তাকাল। ডেভিড বলল,–আইন অফিস থেকে জানানো হয়েছে আমাদের মামলাটা বিচারপতি টিসসা উইলিয়াম-এর আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ওরা একদল

ডাক্তারকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করবে যারা বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটায় বিশ্বাস করে না। আমার ঐ যুক্তিকে তারা সাক্ষী হয়ে উড়িয়ে দেবে।– সান্দ্রা বলে,–তাহলে?– ডেভিড বলে,–যে করেই হোক আমাকে বোঝাতে হবে বিচারপতিকে যে অ্যাশলে খুন করেনি। খুনের সময় হাজির থাকলেও পরিবর্তিত সত্তার দ্বারা সে চালিত হয়েছে। প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা কি বোঝাতে পারব?–

বিচার শুরুর পাঁচদিন আগে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। জেসির অফিসে একটা ফোন এল। বিচারপতি টিসসা উইলিয়াম ডেভিডের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ডেভিডের সঙ্গে দেখা করতে চান। জেসি বলল,–উনি হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন? ব্যাপারটা তো খুব একটা প্রচলিত নয়। মহিলা তো সৎ, আদর্শবাদী, কঠোর মনোভাবের বিচারপতি।– ডেভিড জানতে চায়,–আর সরকারী উকিল কে হতে পারে?–মিকি ব্রাননান, আইরিশ। খুবই ধুরন্ধর। ওর সম্পর্কে সাবধান।–

বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় ডেভিড সান্তা ক্লারা শহর আদালতের চারতলা বাড়িটায় বিচারপতি টিসসা উইলিয়ামের ঘরে ঢুকল। সেখানে মিকি ব্রাননানও উপস্থিত ছিলেন। মধ্য পঞ্চাশের বেঁটেখাটো, কাঁচা পাকা চুলের পুরুষ। বিচারপতি মধ্য চল্লিশের পাতলা চেহারার, ব্যক্তিত্বশালিনী, গম্ভীর। তিনি বললেন,–মিঃ সিঙ্গার, শুনলাম আপনি মানসিক অসুস্থতার কারণে আসামিকে নির্দোষ বলছেন?–হ্যাঁ।–আসলে আমি আপনাদের দুজনকেই বলতে চাই শুধু শুধু সরকারি অর্থের অপচয় করা আমার পছন্দ নয়। এই মামলায় যা হতে চলেছে, আমি চাই আসামি তার দোষ স্বীকার করুক এবং তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক।– ডেভিড বলে–তা হতে পারে না। আমার আসামী নির্দোষ।– বিচাপতি ধরা গলায়

বলেন,–মিঃ সিঙ্গার।– ডেভিড তাকে থামিয়ে বলে ওঠে,–আমার মক্কেল নির্দোষ। কারণ লাই ডিটেক্টর পরীক্ষায় সে পাশ করেছে।–

বিচারপতি বললেন,–তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। মামলা দীর্ঘ করলে সময় নষ্টই হবে। আমি আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি আসামি নিজে খুন করলেও সেটা তার করা অপরাধ নয় তার অলটার ইগোর অপরাধ একথা আপনি আদালতে প্রমাণ বা বিশ্বাস করাতে পারবেন না।– ডেভিড বলে,–আমার পক্ষে তা অসম্ভব নয়।– বিচারপতি বললেন,–আপনি খুব জেদী। অনেকেই এটাকে ভাল গুণ বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আপনি আমায় বাধ্য করছেন অর্থহীন একটা মামলায় জড়িয়ে পড়তে।– ডেভিড বলে,–আপনি এভাবে মামলাটাকে দেখলে আমার কিছু করার নেই। আমি বিদায় নিচ্ছি।– বিচারপতি কঠিন স্বরে বললেন,–তাহলে আগামী সপ্তাহে আদালতেই দেখা হবে।–

.

১৫.

ছোট শহর সানজোস ভিড়ে গিজগিজ করছে। পৃথিবীর নানা দেশের পত্রপত্রিকা, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভির সাংবাদিকে শহর ভরে গেছে। হোটেল সব ভর্তি। ডেভিড বা মিকি ব্রাননানকে দেখা মাত্র সাংবাদিকরা ছুটে আসছে। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ছাড়ছে। সান্তা ক্লারা আদালতের কাছাকাছি ডেভিড একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সাক্ষীদের তৈরি করছে। মামলা শুরুর কয়েকদিন আগে ডাঃ সালেম সান্তা ক্লারায় ডেভিডের অফিস ঘরে

এসে, হাজির হলেন। বললেন,–আমি আর একবার অ্যাশলেকে সম্মোহন করে দেখতে চাই কোন নতুন তথ্য, সাক্ষ্য, প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা।–

জেলে অ্যাশলের মুখোমুখি হল ওরা। ডেভিড বলে,–সুপ্রভাত অ্যাশলে, ডাঃ সালেমকে মনে আছে তোমার? উনি তোমাকে আর একবার সম্মোহন করতে চান। তোমার আপত্তি নেই তো?—

তীব্র আতঙ্কে অ্যাশলে বলে,–উনি অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চান?–হ্যাঁ।–কিন্তু আমি চাই না, আমি ওদের ঘৃণা করি।–ঠিক আছে অ্যাশলে। আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই তুমি ওদের হাত থেকে ছাড়া পাবে।– ডাঃ সালেম তার কাজ শুরু করেন। –রিল্যাক্স...রিল্যাক্স অ্যাশলে...মনটাকে হাল্কা করে দাও।– দশ মিনিটের ভেতরেই অ্যাশলের চেহারায় পরিবর্তন ঘটে। –আমি অলিটটে পিটার্স-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।– ওরা লক্ষ্য করে অ্যাশলের চেহারায় নরম একটা ছাপ পড়ছে। নরম ইতালিয় উচ্চারণে শোনা যায়,– Buon giorono.– ডাঃ সালেম বলেন,–সুপ্রভাত, কেমন আছ অলিটটে?–খুব কঠিন সময় এটা।–ঠিক। তবে শিগগিরই আমরা এটা কাটিয়ে উঠব। অলিটটে তুমি কি জিম ক্লেয়ারিকে চিনতে?–না।–রিচার্ড মেলটনকে?–হ্যাঁ। ওর সাথে যা ঘটল তা খুব মর্মান্তিক ঘটনা।–ওর সাথে শেষ তোমার কখন দেখা হয়েছিল?–আমরা সানফ্রান্সিসকোতে একটা চিত্রশালা দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর রাতের খাওয়া সেরে ওর ফ্ল্যাটে যেতে বলেছিল আমায়। আমি যাইনি। গেলে হয়ত ওর প্রাণটা বাঁচত। রাতের খাবার পর আমি কাপেরটিনো-তে ফিরে আসি।–ধন্যবাদ অলিটটে।–

অ্যাশলের মুখে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। ডাঃ সালেম বলেন,–টোনি তুমি কি আছ?– অ্যাশলের চেহারায়, ভঙ্গিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। চড়া সুরে সে গেয়ে ওঠে

–Up and down the city road
In and out of the eagle
That the way the money goes
Pop! goes the weasel

–ডাঃ সালেমকে সে বলে,–এই গানটা আমার এত প্রিয় কেন জান? আমার মা এই গানটাকে ঘৃণা করত।–কেন তিনি তোমায় ঘৃণা করতেন?– ডাঃ সালেম জানতে চান। –সেটা তো সেই মহিলাই বলতে পারবেন। আর তিনি এখন যেখানে সেখানে কেউ তাকে প্রশ্ন করতে যেতে পারব না।– বলে সে হাসতে থাকে।

তারপরই শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে,–ভগবান আমাদের নিয়ে এক মজার খেলা খেলছিল, না?– ডাঃ সালেম বলেন,–তুমি ভগবান বিশ্বাস কর?–হয়তো করি, হয় তো করি না।– কিন্তু টোনি তুমি কি মনে কর কোন মানুষকে খুন করার অধিকার তোমার আছে?– কোন্ অঞ্চল থেকে ভেসে আসে ওর কণ্ঠস্বর,–যতক্ষণ না সেটার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।– ডেভিড ও ডাঃ সালেম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। ডাঃ সালেম বলেন,–তুমি কী বলতে চাইছ?–ধরুন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কাউকে খুন করা দরকার হতে পারে।– ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। বলে,–আমায় একটু একা থাকতে দিন।– ডাঃ সালেম ডাকেন–টোনি।– কেউ সাড়া দেয় না। আবারও ডাকেন। কেউ সাড়া দেয় না।

ডেভিডকে ডাঃ সালেম বলেন,–ও চলে গেছে। এবার অ্যাশলেকে ফিরিয়ে আনি।– মিনিট কয়েক পরেই অ্যাশলে চোখ খোলে। বলে–খুব ক্লান্ত লাগছে।–ঠিক আছে, বিশ্রাম নাও। বিকেলে আবার আসব।–

ডাঃ সালেম ডেভিডকে বললেন তুমি অ্যাশলেকে সাক্ষীর আসনে তুলে জেরা করলেই তো সব প্রকাশ হয়ে যাবে।–না, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। সরকারী উকিল এমন সব প্রশ্ন করবে যে পুরো ব্যাপারটাই আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।–

ডেভিড সেদিন রাতের খাওয়া সারছিল কুইললারে সঙ্গে। বলল,–আমাকে একটা বিরাট সিদ্ধান্ত খুব তাড়াতাড়ি নিতে হবে। অ্যাশলেকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলা উচিত হবে কিনা সেটাই ঠিক করে উঠতে পারছি না।– কুইলোর বলে,–ঠিকই। ব্রাননান অ্যাশলেকে একজন বিকৃতকাম, হিংস্র খুনি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে যদি অ্যাশলেকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় না তোলা। হয়। আবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুললে ঐ ব্রাননান তাকে শেষে করে দেবে।– ডেভিড বলে,–তাছাড়া একদল ডাক্তারকেও সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার করা হবে যারা বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।– জেসি বলে,–পরিস্থিতি জটিল।–

এই কেসে জুরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্রাননান ও ডেভিডের পছন্দ একেবারে ভিন্নধর্মী। ব্রাননান জুরি বোর্ডে পুরুষ সদস্য চাইছিল কারণ একজন মহিলা সিরিয়াল কিলার, যে খুনের আগে শিকার পুরুষটির সঙ্গে যৌনমিলন উপভোগ করত, তারপর তার পুরুষাঙ্গ ছেদন করে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করত। এরকম এক হিংস্র খুনির প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা বোধ করবেন। তাই কঠিন সাজা দেবেন। ডেভিড চাইছিল জুরি বোর্ডে মহিলাদের

উপস্থিতি বেশী হোক। কারণ কোন মহিলা নিশ্চয় অন্য মহিলার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে।

মামলার আগের দিন বারো সদস্যের জুরি বেছে নেবার পর দেখা গেল পাঁচজন মহিলা ও সাতজন পুরুষ। জুরি সদস্যের তালিকা প্রকাশ হলে ব্রাননান ডেভিডের দিকে তাকিয়ে হাসলেন অর্থাৎ ও হেরে যেতে চলেছে।

.

১৬.

মামলার দিন ডেভিড জেলে অ্যাশলের সঙ্গে দেখা করতে গেল। অ্যাশলে উন্মাদের মত চেঁচাতে থাকে,–চলে যাও, আমাকে একা থাকতে দাও।– ডেভিড ওকে বোঝায়,–শান্ত হও। আমরা এখন জিতব, তুমি দেখ।–আমি যেন একটা নরকে রয়েছি।–খুব শিগগিরই তুমি এখান থেকে মুক্তি পাবে। তুমি সবসময় মনে রাখবে তুমি নির্দোষ। আমি তোমার সঙ্গে আছি।– অ্যাশলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে বলে,–আমি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করব।–

আদালত কক্ষ ভিড়ে ঠাসা। দর্শক আসনে ডাঃ প্যাটারসন। তার জেসি ও তার স্ত্রী এমিলিও উপস্থিত ছিল। বিচারক টিসসা উইলিয়াম নির্দিষ্ট সময়ে বিচার কক্ষে ঢুকে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। আদালতের করনিক হাঁক পাড়ল,–সরকার, রাজ্য বনাম অ্যাশলে প্যাটারসন মামলা শুরু হল।– বিচারপতি সরকারি উকিল মিকি ব্রাননানকে বললেন,–আপনার কিছু বলবার আছে?–হ্যাঁ, মহামান্য বিচারপতি, সুপ্রভাত এবং নমস্কার। মাননীয় জুরিরা অবগত আছেন যে আসামি একজন পুরুষ খুনি, বিকৃত যৌন

মানসিকতার নারী।– অ্যাশলের দিকে তাকিয়ে বললেন,–আসামির সরল, আততাড়িত চেহারাটা হল মুখোশ। আসামি স্ব-ইচ্ছায় খুনগুলি করেছেন। যদিও প্রতিটি খুনের ক্ষেত্রে সে আলাদা আলাদা নাম, পরিচয় ব্যবহার করেছে।–

বিচারপতি এবার ডেভিডকে বললেন,–আপনার কী বক্তব্য?– ডেভিড বলে,–মাননীয়া বিচারপতি, মাননীয় জুরি কমিটির সদস্যরা, আমি প্রমাণ করে দেব যা ঘটেছে তার জন্য আমার মকেল অ্যাশলে প্যাটারসন দায়ী নন। কারণ খুনগুলো সে সচেতন ভাবে করেনি। আমার মক্কেল এক জটিল ও বিরল মনোররাগের শিকার। যার নাম মালটিপল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার। এই এম. পি. ডি, এক প্রমাণিত অসুখ। এই অসুখের প্রাচীন ইতিহাস আছে।– এবার সে আদালতে অসুখটার বিবরণ দিতে থাকে। ব্রাননানের মুখে একটা তির্যক হাসি লেগে থাকে।

ডেভিড বলে চলেছে,–অ্যাশলে শারীরিক ভাবে খুনগুলো করলেও, মানসিকভাবে করেনি। কারণ অলটার ইগো তার সচেতন মনকে দখল করে নিয়েছিল। আমি কয়েকজন বিখ্যাত মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করব। তাই মাননীয় বিচারপতি ও জুরিদের কাছে আমার আবেদন, যে অপরাধগুলোর জন্য অ্যাশলেকে দায়ী করা হচ্ছে তাতে ওর কোন নিয়ন্ত্রণই ছিল না।– ডেভিড় নিজের আসনে ফিরে যায়। বিচারপতি সরকারি উকিল ব্রাননানকে জিজ্ঞেস করেন,–আপনি তৈরি?–নিশ্চয়ই।– আদালতের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বিকট শব্দ করে ঢেকুর তুললেন তিনি। সারা আদালত থমকে গেল। তিনি কিন্তু দুঃখপ্রকাশ করলেন না। বললেন,–আমি তো নই। ঢেকুর তুলেছে আমার অলটার ইগো।– আদালতে হাসির রোল ওঠে। ডেভিড ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে বলে,– অবজেকশন ইওর অনার। এটা নিদারুণ ভাবে আদালত অবমাননা।–অবজেকশন

সাসটেইনড।– ব্রাননান বলে,–মাফ করবেন, ইওর অনার।– ব্রাননান জুরি সদস্যদের আসনগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। ঠান্ডা গলায় বলে,–খুন হয়েছে পাঁচটি, এবং তিনটির বিচার এই আদালতে হচ্ছে। আমরা চর্মচক্ষে মাত্র একজন আসামিকেই কাঠগড়ায় দেখতে পাচ্ছি।– আঙুল তুলে অ্যাশলেকে দেখান তিনি। এবার বিশেষজ্ঞদের মুখ থেকেই বরং শোনা যাক এম. পি. ডি, অসুখ সম্বন্ধে। আমার প্রথম সাক্ষী স্পেশ্যাল এজেন্ট ভিনসেন্ট জর্ডন।– আদালত করনিক হাঁক পাড়ে ভিনসেন্ট...জর্ডন...হাজির..হো...ন।–

ছোটখাট চেহারার টাকমাথার মাঝবয়সী পুরুষ কাঠগড়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে কাঠগড়ায় উঠতে বলে ব্রাননান বলেন,–আপনি তো এফ. বি. আই. ওয়াশিংটনের সঙ্গে যুক্ত?–হ্যাঁ, আঙুলের ছাপ পরীক্ষা বিভাগে আছি আমি।–কত বছর?–পনেরো বছর।–এই দীর্ঘ সময়ে আপনি দুজন বা তিনজন আলাদা ব্যক্তির একই আঙুলের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন কী?–না, তা হতেই পারে না। জন্ম থেকে প্রতিটি মানুষের রেখা আলাদা হয়। এই ছাপ তোলবার পর সেই রেখার তফাত দেখে একজন মানুষের থেকে অন্যকে আলাদা করা যায়। প্রতিমাসে আমাদের প্রধান কমপিউটারে তিরিশ চল্লিশ হাজার নতুন ফিঙ্গার প্রিন্ট রেকর্ড জমা হয়। আমাদের দফতরে দশ কোটি আঙুলের ছাপ জমানো আছে শেষ হিসেব অনুযায়ী।–

ব্রাননান বিচারপতি ও জুরিদের দিকে ফিরে বলেন,–দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ কখনোই একরকম হতে পারে না। আপনারা এই তথ্যটি অবশ্যই নোট করুন।– জর্ডনকে বললেন,–যে খুনের মামলার বিচার চলছে সেই তদন্তে পাওয়া আঙুলের ছাপগুলো তো আপনিই পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন?–হ্যাঁ।–ঐ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?–ঘটনাস্থলে পাওয়া আঙুলের ছাপ আর মিস প্যাটারসনের থেকে নেওয়া

আঙুলের ছাপের নমুনা, দুটো হুবহু এক।– আদালতে শোরগোল শুরু হল। বিচারপতি হাতুড়ি ঠুকে বললেন অর্ডার, অর্ডার।– জর্ডনকে আবার বললেন ব্রাননান,–আপনার কোন ভুল হচ্ছে না তো? তিনটি খুনের ঘটনাস্থল এবং মৃতদেহগুলো থেকে পাওয়া আঙুলের ছাপ অ্যাশলে প্যাটারসনেরই?–হ্যাঁ আমি নিশ্চিত।–ধন্যবাদ মিঃ জর্ডন।–

ডেভিড এবার সাক্ষীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিনসেন্ট জর্ডনকে জিজ্ঞেস করে,– আপনারা যে সব ছাপ ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করেন সেগুলো মুছে দেবার চেষ্টা করে না অপরাধীরা?–হ্যাঁ, তা করে। লেজার টেকনিকের সাহায্যে ছাপগুলো স্পষ্ট করে নিতে হয়।–এ ক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছিল?–না, ছাপগুলো স্পষ্টই ছিল। যে কোন কাঁচা অপরাধী ছাপগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করে।–তার মানে অ্যাশলে তার অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না তাই সে ছাপ মুছতে চেষ্টা করেনি।–

সরকারি উকিল এবার বলে,–আমার পরের সাক্ষী স্ট্যানলি ক্লার্ক।– লম্বা চুলের পাতলা চেহারার এক অল্পবয়সী পুরুষ এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান। –আপনার পেশা কী?–আমি জাতীয় বায়োটেক ল্যাবরেটরিতে ডি-অক্সি-রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করি। যাকে সবাই ডি. এন. এ. বলেই জানে।–কবছর কাজ করছেন?– সাত বছর।–তার মানে আপনি অভিজ্ঞ। ডি. এন. এ. কি দুজন মানুষের এক হতে পারে?–না। পাঁচ কোটিতে একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের ডি. এন. এ. মিলে যাবার সম্ভবনা থাকে। আমরা লালা, পুরুষ বীর্য, যোনিরস, রক্ত, চুল, দাঁত, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি থেকে ডি. এন. এ. পরীক্ষার উপাদান সংগ্রহ করি।–আপনি নিজে কি টিব্বলে, ব্লেক, মেলটনের খুনের ঘটনায় ডি. এন. এ. বিশ্লেষণ করেছিলেন?–হ্যাঁ, তিনটি জায়গায় পাওয়া চুলের অংশ, যোনিরসের দাগ, লালা সবই অ্যাশলে প্যাটারসনের ডি. এন. এ.

প্রোফাইলের সঙ্গে হুবহু ম্যাচ করে গেছে। আদালত কক্ষে আবার শোরগোল উঠল। বিচারপতি হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে বললেন,–এবার আমি সকলকে বার করে দিয়ে ফাঁকা ঘরে বিচারের আদেশ দেব।–

ব্রাননান বলেন,–তার মানে ডি. এন. এ. প্রমাণের ভিত্তিতে আপনার মতে অভিযুক্তই তিনটি খুন করেছে?– ডেভিড প্রতিবাদ জানায়–অবজেকশন ইওর অনার, সরকারি উকিল সাক্ষীকে ভুল কথা বলতে প্ররোচিত করছেন।–অবজেকশন সাস্টেইনড।– ব্রাননন বলে,–ঠিক আছে। সাক্ষীকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমি জানি আমার আইনজীবী বন্ধুটি বুঝে গেছেন যে তার মক্কেলই তিনটি খুন করেছেন।– ডেভিড আবার উঠে দাঁড়ায়। –মাননীয় বিচারপতি....– বিচারপতি বলেন,–সাসটেইন্ড, মিঃ ব্রাননান আপনি কিন্তু আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন।– ব্রাননান বলেন,–মাফ করবেন। আমি দুঃখিত।–

এরপর আদালতে দুপুরের খাবার বিরতি হল। দুটোয় আবার কাজ শুরু হল। এরপর সাক্ষী দিতে এলেন ডিটেকটিভ লাইটম্যান। ব্রাননান জিজ্ঞেস করেন,–ডেনিস টিব্বলের খুনের খবর কে প্রথম আপনাকে দিয়েছিল?– গোয়েন্দা বলেন,–বিল্ডিং সুপার প্রথম আমায় ফোনে খবর দেন।–ঘটনাস্থলে গিয়ে আপনি কী দেখেন?–সে এক বীভৎস দৃশ্য। সারা ঘরে রক্ত ছড়ানো। ডেনিস টিব্বলের নগ্ন মৃতদেহ খাটে। পুরুষাঙ্গ কেটে নেওয়া হয়েছে। শরীরটা ক্ষতবিক্ষত করে কোপানো হয়েছে।–সেখান থেকে আপনি কী কী প্রমাণ সংগ্রহ করেন?–নিহত যে যৌনমিলন করেছিল তার প্রমাণ পাই। বিছানার চাদরে এবং মৃতের শরীরে নারী যোনিরস পাওয়া যায়। আঙুলের ছাপও পাওয়া যায়।–আপনার কাউকে গ্রেফতার করেননি কেন?–কারণ ক্রাইম স্পটে পাওয়া প্রমাণ, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও

ডি. এন. এ. আমার কমপিউটারে রাখা নমুনার সঙ্গে ম্যাচ করেনি। অবশেষে যখন অভিযুক্ত অ্যাশলে । প্যাটারসনকে পাওয়া গেল, তার আঙুলের ছাপ ও ডি. এন. এ. নমুনা মিলে গেল ঘটনার জায়গায়গুলোয় পাওয়া আঙুলের ছাপ ও ডি. এন. এ প্রোফাইলের সঙ্গে।–

দ্বিতীয় দিন সাক্ষী এলেন ব্রায়ান বিল। তাকে ব্রাননান প্রশ্ন করেন তার পেশা কী? –আমি সানফ্রান্সিসকোর ডে ইয়ং চিত্রশালার দ্বার রক্ষক।–আপনাদের শিল্পশালায় নিশ্চয়ই প্রচুর দর্শক আসেন?–হ্যাঁ।–একই দর্শক বার বার আসেন কি?–হ্যাঁ, বিশেষ করে তরুণ শিল্পীরা তো প্রায়ই আসেন।–রিচার্ড মেলটনকে চিনতেন?–নিশ্চয়ই। দারুন প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন তিনি।–তাকে কি কোন যুবতীর সঙ্গে দেখেছিলেন?–হ্যাঁ, অলিটটে পিটার্স। মেলটন নিজেই ওর সেই বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।– ব্রাননান বলেন,–দেখুন তো এখানে তিনি উপস্থিত আছেন কীনা—া, ঐ তো!– ব্রায়ান হিল অ্যাশলেকে দেখায়। ব্রাননান বলেন,–উনি তো অ্যাশলে প্যাটারসন। যাই হোক, এঁকে আপনি চিত্রশালায় মেলটনের সঙ্গে দেখেছেন?–হ্যাঁ, অনেকদিন দেখেছি। যেদিন তিনি খুন হন সেদিনও সন্ধ্যা অবধি দেখেছি। সন্ধ্যা বেলায় একসঙ্গে দুজনে বের হন।–আচ্ছা, আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন যে অ্যাশলে আর অলিটটে একই ব্যক্তি?– কাঠগড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে, ব্রাননান জিজ্ঞেস করে। মনে তো হচ্ছে একই ব্যক্তি।–ধন্যবাদ মিঃ হিল। আমার আর কিছু প্রশ্ন নেই।– বিচারপতি ডেভিডকে বলেন,–আপনার যা জিজ্ঞেস করার করুন।–

ডেভিড উঠে দাঁড়ায়।–ধন্যবাদ ইওর অনার।– তারপর সে ব্রায়ান হিলের কাঠগড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মিঃ হিল, আমি লক্ষ্য করলাম আপনাকে যখন সরকারি উকিল অলিটটে

আর অ্যাশলে একই ব্যক্তি কিনা জিজ্ঞেস করেন আপনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কেন?–ইয়ে...মানে...ঐ মহিলাটি একই মনে হচ্ছে। তবে কিছু অমিলও আছে। যেমন অলিটটে পিটার্স ছিলেন ইতালিয়। চুল আঁচড়াবার ধরন অন্যরকম। বয়সও কম।– ডেভিড জুরিদের দিকে তাকায়,–কথাগুলি নোট করা হোক। ঐ রকম তো হবারই কথা। অলিটটে পিটার্স রোমে জন্মেছে। সানফ্রান্সিসকোর অ্যাশলের চেয়ে আট বছরের ছোট।–

ব্রাননান অন্য সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন,–আপনার নাম?–গ্যারি কিং।–ঘটনার রাতে রিচার্ড মেলটনের মৃতদেহ আপনিই প্রথম দেখতে পান?–হ্যাঁ, আমি রিচার্ডের সঙ্গে এক ঘরে ভাড়া থাকতাম। পার্টি থেকে ফিরে দেখি বিছানায় মেলটনের নগ্ন মৃতদেহ–পুরুষাঙ্গ কর্তন করা। ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ।–ধন্যবাদ মিঃ কিং।– ডেভিড এবার তার দিকে এগিয়ে যায়। বলে,–আপনার বন্ধুর সম্পর্কে কিছু বলনু কেমন স্বভাব ছিল ওঁর?–উনি শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন।– উনি কি উগ্র স্বভাবের প্রেমিকা পছন্দ করতেন?–না তো। বরং শান্ত স্বভাবের নরম মনের মেয়েই পছন্দ করতেন।–অলিটটের সঙ্গে প্রায়ই তো খুব ঝগড়া হত ওর; তাই না?–মোটেই না। ওদের বোঝাঁপড়া ছিল অত্যন্ত ভাব?– ডেভিড একটু চুপ করে থেকে তীব্র গলায় বলে। অলিটটে পিটার্সের দ্বারা আপনার বন্ধু রিচার্ড মেলটনের কোন ক্ষতি হওয়া কি সম্ভব? এমন নরম মনের মেয়ে কি কারো ক্ষতি করতে পারে?– ব্রাননান চেঁচিয়ে উঠলেন–অবজেকশন, ইওর অনার, সাক্ষীকে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে।–অবজেকশন সাস্টেইন্ড।– ডেভিড বলে,–আমার প্রশ্ন শেষ।– অ্যাশলের পাশে এসে বলে এবার মামলা আমাদের দিকে ঘুরে যাবে।–

.

১৭.

শেরিফ ডাওলিং এখন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। ব্রাননান বলেন,–আপনার সহকর্মী, সহকারী শেরিফ স্যাম ব্লেক খুন হবার রাতে অফিস ছেড়ে বেরোবার আগে আপনাকে বলেছিলেন তো যে তিনি নিরাপত্তা দিতে অ্যাশলের ফ্ল্যাটে থাকবেন?– ।–তারপর?–তারপর সহ শেরিফের মৃতদেহ পাবার খবর আসে পরদিন সকালে। অন্য চারটি খুনের মত স্যাম ব্লেকের মৃতদেহ একই অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।– ব্রাননান চেঁচিয়ে উঠলেন,–তার মানে। পাঁচটি খুনই একই ব্যক্তির করা?– ডেভিড বলে,–আমি আপত্তি জানাচ্ছি। সরকারি উকিল সাক্ষীকে দিয়ে জোর করে কিছু বলিয়ে নিতে চাইছেন।–আপত্তি মেনে নেওয়া হেল।– ব্রাননান আবার বলে,–এরপর আপনি কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?–স্যাম ব্লেকের মৃত্যুর পর সন্দেহভাজন অ্যাশলেই যে খুনি এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আমরা তার আঙুলের ছাপ ও ডি. এন. এ.-এর নমুনা সংগ্রহ করি। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া আঙুলের ছাপ, ডি, এন, এ-র নমুনার সঙ্গে মেলানো হয়। দুটো নমুনা হুবহু মিলে যায়। তারপর আমরা তাকে গ্রেফতার করি।–ধন্যবাদ শেরিফ।–

ডেভিড সাক্ষীর কাঠগড়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে,–অভিযুক্তকে গ্রেফতারের সময় আপনারা তার ফ্ল্যাটে তল্লাসির সময় একটি রক্তমাখা চপার খুঁজে পান। কোথায় পান?– রান্নঘরের বেসিনে।–তার মানে খুনি রাতে খুন করে সকাল আটটা পর্যন্ত খুনের অস্ত্র খোলা জায়গায় রেখে দিল। ছুরিতে রক্তও লেগে ছিল। এরকম কি হওয়া সম্ভব মিঃ ডাওলিং?– ডাওলিং চুপ করে থাকে। ডেভিড ধমকে ওঠে,–চুপ করে থাকবেন না, জবাব দিন।– শেরিফ ডাওলিং মাথা নাড়েন,–হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।– ডেভিড বলে,– এরকম কখন হওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?– ডাওলিং বিব্রতভাবে বলে,–যখন

অভিযুক্তকে ফসানো হয়, নেশার ঘোরে যদি কাজটা করে থাকে, খুনটা যদি অভিযুক্ত না করে থাকে।–ধন্যবাদ। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।–

ব্রাননান এবার বলে,–মাননীয় বিচারপতির অনুমতি পেলে আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই।– বিচারপতি অনুমতি দেন। দুজন আদালত কর্মী একটা বড় আয়না এনে রাখে। কাঁচে লাল লিপস্টিক দিয়ে কেউ লিখে রেখেছে,–তুমি মরবে।– বিচারপতি বললেন,–এটা কী?– ব্রাননান উজ্জ্বল মুখে বলেন,–আমার বিপক্ষের উকিল প্রমাণ করতে চাইছেন অ্যাশলে নির্দোষ। সে সচেতন ভাবে খুন করেনি। ঐ আয়নাটি বিপক্ষের উকিলের কথাকে মিথ্যে প্রমাণ করবে। ঐ আয়নাটা অভিযুক্তের স্নানঘর থেকে তুলে আনা হয়েছে। ঐ হুমকির জন্যই নিরাপত্তা চেয়ে স্যাম ব্লেককে রাতে ফ্ল্যাটে থাকতে বলা হয়েছিল। অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবেই এই খুন করা হয়েছে। এর পরের সাক্ষী মিস নিভেনকে ডাকছি।

মাঝবয়সী মাঝারি স্বাস্থ্যের বেঁটেখাটো এক মহিলা সাক্ষীর কাঠগড়ায় এলেন। ব্রাননান বললেন,–আপনার নাম?–মিস নিভেন।–পেশা?–আমি হস্তলিপি বিশারদ।– ব্রাননান বলেন,–আপনি এই লেখাটা দেখেছেন?–হ্যাঁ, তদন্ত চলাকালীন আমাকে এই লেখাটার সঙ্গে নমুনা হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে দেওয়া হয়েছিল।–সেই নমুনা হাতের লেখাটি কার?–অ্যাশলে প্যাটারসনের।–তা বিশ্লেষণে কী জানা গেল?–ঐ আয়নার লেখা এবং মিস প্যাটারসনের হাতের লেখা হুবহু এক।– ব্রাননান বিস্মিত হবার ভান করে বলে,–সে কি, অভিযুক্তা নিজে আয়নায় ঐ লেখাগুলো লিখেছিল?– মিস নিভেন বলেন,–আমি নিঃসন্দেহ।– ব্রাননান বলেন,–এই তথ্যটা নোট করা হোক।– এবার ডেভিড উঠে দাঁড়ায়। বলে,–এই সাক্ষীকে আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।– অ্যাশলে মাথা নিচু করে

বসে আছে। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ডেভিড তাকে বলে,–ভেঙে পড় না। সব ঠিক হয়ে যাবে।–

.

১৮.

মামলা শুরু হবার পর তিনমাস কেটে গেছে। ডেভিড একদিনও ভাল করে ঘুমায়নি। এক রাতে একসাথে রাতের আবার খেতে খেতে সান্দ্রা বলল,–ডেভিড, সানফ্রান্সিসকোতে এবার আমি ফিরে যাব। এসৈ আমার কাছে থাকবেন। ডাঃ বেইলিকে ফোন করেছিলাম। উনি বলেছেন, এখন ওনার কাছাকাছি থাকতে হবে।– ডেভিড বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। বলে,–তাই তো। আমার খেয়ালই ছিল না। আর তো তিন সপ্তাহ বাকি। আমি ঠিক সময় বার করে কাল তোমায় দিয়ে আসব।–তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। এমিলি আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। ও জেসি কুইললারের স্ত্রী।–

পরদিন এমিলি এসে গাড়ি নিয়ে হাজির হল। সান্দ্রা ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে বলে,–আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছেন না।– ডেভিড বলে,–মামলা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা করছি বাচ্চা হবার সময়ে আমি সানফ্রান্সিসকোতে তোমার পাশে থাকতে পারব। নিজের যত্ন নিও।– গাড়িতে উঠে সান্দ্রা বলে,–তুমি আমায় নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার সব মনোসংযোগ মামলায় দাও। এই মামলা তোমায় জিততেই হবে।– সান্দ্রা চলে যায়। এবং তখনই ডেভিড অনুভব করে সে কী ভীষণ একা।

আদালতের কাজ শুরু হতে মিকি ব্রাননান বলেন,–আমার পরের সাক্ষী ডাঃ লরেন্ড লারকিন্স।– ডাঃ লারকিন্স আমি শুনেছি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তবুও এই মামলায় সাক্ষী দিতে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।–এ তো আমার কর্তব্য।–ডাঃ লারকিন্স আপনি কোন সংস্থার সঙ্গে জড়িত?–আমি গত তিরিশ বছর ধরে শিকাগোতে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করছি। এছাড়াও আমি শিকাগো সাইক্রিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।–এই দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে আপনি নিশ্চয়ই মালটিপল পারসোনালিটি ডিজ অর্ডারের বহু রোগীর চিকিৎসা করেছেন?–না।– ব্রাননান অবাক হবার ভান করেন,–সে কি? কেন?–কারণ আমি এই ধরনের অসুখে আক্রান্ত রোগী দেখিনি।– দীর্ঘ তিরিশ বছর মানসিক রোগের বিখ্যাত চিকিৎসক হয়েও আপনি এম. পি. ডি-র একজন রোগীও দেখেননি?–না, কারণ এই ধরণের কোন অসুখের অস্তিত্ব নেই।– ব্রাননান বলেন,–ধন্যবাদ। আর কিছু আমার জিজ্ঞাস্য নেই।– ডেভিড সাক্ষীর কাঠগড়ার কাছে দাঁড়িয়ে বলে,–আপনার নিশ্চয়ই প্রচুর মনোরাগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে?– হ্যাঁ।–ডাঃ রয়েস সালেমকে আপনি চেনেন?–হ্যাঁ। তিনি অন্যতম সেরা চিকিৎসক।–ডাঃ ক্লাইভ ডনোভান? ডাঃ রে ইনগ্রাম?–এরা দুজনেই অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এবং দক্ষ চিকিৎসক।–আচ্ছা ডাক্তাবাবু, মানসিক রোগ নিয়ে কি মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা সর্বদা একমত হন?–না, তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকে।–তাই আপনি যে অসুখটির অস্তিত্ব নেই বলে মনে করেন ডাঃ সালেম, ডাঃ ডনোভান এবং ডাঃ ইনঙ্গগ্রাম জানিয়েছেন তারা। এই রোগে আক্রান্ত বহু রোগীর চিকিৎসা করেছেন। তারা কী অযোগ্য ডাক্তার?– না। কখনই না।–ধন্যবাদ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।– ব্রাননান বলেন,–মাননীয়া বিচারপতি, আমি সাক্ষীকে ফের জেরা করতে চাই।–বেশ, করুন।–ডাঃ লারকিন্স, আপনার কি মনে হয় যে যেহেতু অন্য ডাক্তাররা আপনার মত মানতে চাননি তাই

আপনি কি নিজে ভুল করছেন বলে মনে করেন?–না। আমি আরও ডজনখানেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে হাজির করতে পারি যারা এম. পি. ডি.-র অস্তিত্ব মানেন না।– ধন্যবাদ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।–

সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাঃ আপটন। ব্রাননান তাকে প্রশ্ন করেন,–এই অসুখটা চিহ্নিত করার জন্য আপনারা কি টেস্ট করেন?–এর কোন টেস্টই নেই।– ব্রাননান নকল বিস্মিত হয়ে বলেন,–তাহলে অসুখটা দাঁড়িয়ে আছে নিছক অনুমান বা মতের ওপর?–ঠিক তাই।–যিনি দাবি করছেন তিনি এই রোগে আক্রান্ত তিনি কি সম্মোহিত অবস্থায় সত্যি কথা বলবেন?–না, যিনি মিথ্যে বলছেন তার কাছ থেকে সম্মোহন বা Sodium amytal কোন কিছুর সাহায্যেই আসল সত্যকে উন্মুক্ত করা যায় না।–ধন্যবাদ ডাক্তার। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।–

ডেভিড এগিয়ে আসে। বলে,–ডাঃ, আপটন, এই রোগে আক্রান্ত কোন রোগী আপনার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছে?– ।–তাদের চিকিৎসা করেছেন আপনি?–না, যে রোগের কোন অস্তিত্ব নেই তার কি চিকিৎসা করব? একজন রোগীর বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের মামলা চলছিল। তিনি বললেন, তাঁর অলটার ইগো এই কাজ করেছে। এক মহিলা তার সন্তানদের বীভৎসভাবে মারতেন। তিনিও এই কাজের দায় নিতে চাননি। তিনি বলেছিলেন তার মনের মধ্যে থেকে কেউ বের হয়ে এসে কাণ্ডটা ঘটাত। তারা সকলেই কিছু লুকোতে চেয়ে মিথ্যে কথা বলতেন।– ডেভিড বলে,–আপনি কি এ বিষয়ে শেষ কথা বলছেন?–আমি জানি আমি ঠিক।–তার মানে আর সবাই ভুল?– ডেভিড চড়া গলায় প্রশ্ন করে। –না...মানে...! –মানে আপনার মতে কত নামী চিকিৎসকরা সবাই অজ্ঞ, মূর্খ

তাই তো?–না। আমি...আমি সে কথা বলতে চাইনি। আমি সঠিক নই।– ডেভিড বলে,– আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।–

তারপরও আটদিন ধরে ডাক্তারদের সাক্ষ্যগ্রহণ চলল। নয়জন ডাক্তারের অভিমত হল এম. পি. ডি-র কোন অস্তিত্ব নেই। ব্রাননান এরপর খুনের ঘটনাস্থলে মৃতদেহের তোলা ছবিগুলো দেখাতে অনুমতি চাইলেন, ডেভিড আপত্তি করে। কিন্তু বিচারপতির করা ধমকে চুপ করে যায়। ডেভিড ভাবে বিচারপতি গোড়া থেকেই যেন অ্যাশলেকে চরম শাস্তি দিতে তৈরি হয়ে বসেছেন।

ব্রাননান একগুচ্ছ ছবি বের করে জুরি সদস্যদের হাতে দিয়ে বলেন,–আমি জানি এগুলো দেখতে কারোরই ভাল লাগবে না। কিন্তু এই মামলার বিষয়ই যে তাই। ঠান্ডা মাথায়, পরিকল্পিত ভাবে করা কটি খুন।– ছবিগুলো দেখতে দেখতে জুরি সদস্যদের মুখে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রতিফলন দেখতে দেখতে ব্রাননানের মন তীব্র উল্লাসে ভরে ওঠে।

.

১৯.

অ্যাশলে জেলের আবছা অন্ধকার গলি দিয়ে হেঁটে চলছিল। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের উঠোনে ফাঁসির মঞ্চটাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। এক পুলিশ কর্মী এসে বলে,–ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নয়। ওকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে।– তখনই বিচারপতি বলেন,–ওকে বিষ ইঞ্জেকশন দিয়ে মারব ঠিক করেছি।–

ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে ডেভিড দেখে ঘামে ভিজে গেছে ওর সারা শরীর। ওর অবচেতনের দুঃশ্চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে এসেছে। আজ থেকেই তার কাজ শুরু হচ্ছে। উঠে তৈরি হয়ে নেয় ডেভিড।

জুরিদের দিকে তাকিয়ে ডেভিড বলে,–মাননীয় ভদ্র মহোদয়, মহোদয়া, জুরি সদস্যরা, সরকার পক্ষের বক্তব্য আপনারা শুনেছেন। মিঃ ব্রাননান তার অজ্ঞতার জন্য এই অসুখটিকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। তিনি এই জটিল অসুখটির বিষয়ে কিছুই জানেন না। উনি যে সব সাক্ষীকে কাঠগড়ায় এনেছেন তারাও অজ্ঞতার ফলে এই এম. পি. ডি-র অস্তিত্ব মানেন না। কিন্তু এবার আমিও এমন কিছু সাক্ষীকে কাঠগড়ায় আনব যারা এই অসুখের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেবেন। এঁরা সবাই স্বনামধন্য মনোরাগ বিশেষজ্ঞ।

আমার মক্কেলকে এক বিকৃতকাম নিষ্ঠুর খুনী হিসাবে দেখাতে মিঃ ব্রাননান বদ্ধপরিকর। কিন্তু কোন ফাস্ট ডিগ্রি মার্ডার প্রমাণ করতে গেলে অপরাধ মনস্কতাকেও প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ guilty act নয় guilty intention-ই বড় কথা। আমি প্রমাণ করব অ্যাশলে অপরাধ ঘটালেও তার মধ্যে কোন guilty intention ছিল না। সে বহুমুখী সত্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে খুনগুলো করেছিল।– ডেভিড একটু থামে। জুরিদের প্রত্যেকেই ওকে তীব্র চোখে দেখছিল। ডেভিড আবার বলে,–আমেরিকান সাইক্রিয়াট্রিক সোসাইটি স্বীকৃতি দিয়েছে এম. পি. ডি. কে। তাদের সেই রির্পোট আমি আদালতে পেশ করছি। যে অ্যাশলে এই রোগের শিকার হয়ে খুনগুলো করেছে তাকে শাস্তি দিলে কি এক নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়া হবে না? আমি প্রথম সাক্ষী ডাঃ জোয়েল আশানতিকে হাজির হতে বলছি।– তিনি হাজির হলে ডেভিড প্রশ্ন করে,–আপনি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে কোন হাসপাতালের সঙ্গে জড়িত?–নিউইয়র্কের মেডিসন হাসপাতালের সঙ্গে

জড়িত।–আপনি এম. পি. ডি. অসুখটা সম্বন্ধে জানেন?–হ্যাঁ, আমি এরকম কয়েকজন রোগীর চিকিৎসাও করেছি।–কতজন সত্তা একজন মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে?–এভাবে বলা যায় না। কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে শতাধিক সত্তা প্রকাশিত হয়েছে একজনের মধ্যে।– ডেভিড বলে,–কি ভয়ানক ঘটনা। একই মানুষের মধ্যে একশোটি সত্তা লুকিয়ে আছে? আপনি কত বছর এই পেশায় আছেন?–পনেরো বছর।–এম. পি. ডি. রোগীকে কোন একটি সত্তা চালিত করতে পারে?–নিশ্চয়ই।–এটা কি রোগীর অজ্ঞতাসারে ঘটে?–হ্যাঁ।– ডেভিড জুরিদের দিকে দেখে। তারা সবাই নোট নিচ্ছে। –রোগী কি অন্য সত্তাগুলো সম্বন্ধে অবহিত থাকে?–তা বলা যায় না। তবে চিকিৎসা শুরুর আগে পর্যন্ত সাধারণত থাকে না।–এই অসুখ কি সারে?–হ্যাঁ, সারে তবে তা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ চিকিৎসায়।–আপনি নিজে এম. পি. ডি. রোগীকে সারিয়ে তুলেছেন?–হ্যাঁ।–ধন্যবাদ ডাক্তার আশানতি।–

বিচারপতির ডাকে মিকি ব্রাননান ধীর পায়ে সাক্ষীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন,–ডাক্তার আশানতি, এই কেসের তদন্তের সঙ্গে আপনি কোন ভাবে যুক্ত না হয়েও সাক্ষী দিতে এসেছেন কেন? এই মামলায় সাক্ষী হলে প্রচার পাওয়া যাবে কারণ এটা হাই প্রোফাইল কেস–তাই এসেছেন?– ডেভিড বলে,–একজন বিশিষ্ট সাক্ষীকে সরকারি উকিল অপমান করছেন।–আপত্তি খারিজ করা হোল।–

ডাক্তার আশানতি বললেন,–একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাই আমি এসেছি।–আপনি কতজন এম. পি. ডি. রোগীর চিকিৎসা করেছেন?–বারো জন হবে।–এতেই আপনি নিজেকে বিশেষজ্ঞ ভাবছেন? বেশ বলুন তো কোন রোগী সত্যিই ঐ রোগে আক্রান্ত কিনা তা কীভাবে প্রমাণ করবেন? আরও সহজ

করে বলতে গেলে একজন বিকৃত যৌনতার নারী। খুন করে আইনের হাত থেকে বাঁচতে অভিনয় করছেন। আপনি কী করে প্রমাণ করবেন যে ঐ মহিলা সত্যিই অসুস্থ?–ডেভিড চেঁচিয়ে ওঠে,–মাননীয় বিচারপতি, আমার আইনজ্ঞ বন্ধুটি...,–আপত্তি খারিজ করা হল।– ডেভিড কড়া চোখে তাকিয়ে থাকে বিচারপতির দিকে।

ব্রাননান আবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। ডাঃ আশানতি বলেন,–তা প্রমাণ হয়ত করা যায় না, কিন্তু..–ব্যস, আর কিছু আমার জানার নেই।–

ডাঃ রয়েস সালেম সাক্ষীর কাঠগড়ায় এলেন। ডেভিড বলল,–আপনি অ্যাশলকে পরীক্ষা করেছেন?–হ্যাঁ।–আপনার মতামত?– উনি এম. পি. ডি.-তে ভুগছেন। টোনি প্রেসকট এবং অলিটটে পিটার্স নামে দুটো ভিন্নধর্মী বহুমুখী সত্তা দ্বারা পরিচালিত হন। ওঁর ঐ সত্তাদুটির ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ঐ সত্তাগুলি যখন মনের দখল নেয়, তখন মিস প্যাটারসন চলে যেতেন Fugue amnesea-তে। এটা এমন একটা মানসিক অবস্থা যাতে মক্কেলের অজ্ঞানতা হারিয়ে যায়। এটা কয়েক মিনিট কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক মাসের জন্য হতে পারে।–এই অবস্থায় ঘটানো কোন কাজের জন্য তাকে দায়ী করা চলে?–নিশ্চয়ই নয়।–ধন্যবাদ।–

এবার ব্রাননান ডাঃ সালেমকে প্রশ্ন করেন রোগীর,–আপনার সহকর্মী কৃতী প্রতিষ্ঠিত ডাক্তাররা সবাই কি এই অসুখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন?–না, তাও আমি নিজের প্রতি বিশ্বস্ত, কারণ আমি এই রোগাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করেছি।–আপনি কীভাবে এই অসুখ প্রমাণ করেন?–আমি রোগীদের সম্মোহিত করি। সেই অবচেতন অবস্থায় রোগির

আসল মানসিক অবস্থাটা প্রমাণ হয়ে পড়ে।– ব্রাননান বলে,–এরকম জটিল একটা বিষয়ে নিস্পত্তির উপায় সম্মোহন?–

শেন মিলার এবার সাক্ষীর কাঠগড়ায়। ডেভিড বলে,–মিঃ মিলার, আপনার পেশা কী?– আমি গ্লোবাল কমপিউটার গ্রাফিক্স করপোরেশনের সুপার ভাইজার।–অ্যাশলে প্যাটারসন আপনার অধীনে কাজ করতেন?–হা।–আপনি কি ওর মধ্যে কোন মানসিক অসুস্থতার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন?–শ্যা, অ্যাশলে আমায় বলেছিল কেউ তাকে সবসময় অনুসরণ করে। ওকে কেউ খুন করতে চায়। অফিসেও কেউ ওকে কমপিউটারে ছুরির ছবি এঁকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। তা অন্যরাও দেখেছিল।–তার মানে আপনারা ওর মধ্যে মানসিক অসুস্থতার চিহ্ন দেখেছেন?–হ্যাঁ, ওকে সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসা করাতেও বলেছিলাম।–ধন্যবাদ, মিঃ মিলার।–

এবার মিলারের মুখোমুখি হন ব্রাননান। –আপনার অফিসে কতজন কর্মী কাজ করেন, মিঃ মিলার?–তিরিশ জন।–একমাত্র অ্যাশলে প্যাটারসনই কি চিকিৎসার জন্য সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে যেতেন?–না, অনেকেই যেতেন ডাঃ স্পিকম্যানের কাছে।– ধন্যবাদ। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।– ডেভিড,–কিছু প্রশ্ন করার আছে।– বিচারপতি বিরক্ত ভঙ্গিতে বলেন,–অনুমতি দেওয়া হোল।– ডেভিড বলল,–মিঃ মিলার, আপনার অফিসের অন্য কর্মচারীরাও কি জটিল মানসিক রোগের কারণে মনোচিকিৎসকের কাছে যেতেন?– মিলার হাসে–না, না, সেগুলো সবই খুব সাধারণ সমস্যা, স্বামী বা প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া, দুরন্ত বাচ্চা এইসব।–ধন্যবাদ, মিঃ মিলার।–

.

২০.

মামলা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ডেভিড একদিন সকালে জেলে গিয়ে অ্যাশলের সঙ্গে দেখা করল। অ্যাশলের চোখে চরম নিরাশা। ডেভিড বলে,–অ্যাশলে, আদালতে জুরিদের, বিচারককে তোমার বোঝাতে হবে যে তুমি ভাল মেয়ে। কোন অপরাধ করনি। ওদের বোঝাতে হবে যে তুমি মানসিক ভাবে অসুস্থ।–আমাকে কী করতে হবে?– তুমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে সত্যি কথাগুলো বিচারক ও জুরিদের বলবে।– অ্যাশলে বিস্ফারিত চোখে কাঁপতে কাঁপতে বলে, না। আমি পারব না।– ডেভিড দৃঢ় ভাবে বলে,–তোমাকে পারতেই হবে অ্যাশলে। তুমি শুধু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের ঠিকঠিক উত্তর দেবে।

আদালতের কাজ শুরু হল। ডেভিড বিচারপতিকে বলে,–মাননীয় বিচারপতি আমার পরের সাক্ষী অভিযুক্ত অ্যাশলে প্যাটারসন।– অবাক হয়ে বিচারপতি অনুমতি দেন। মহিলা পুলিশের পাহারায় অ্যাশলে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। শরীরে মৃদু কাঁপুনি। বিব্রতভাব। আদালতের কেরানি ওকে শপথবাক্য পাঠ করায়। ডেভিড ওকে বলে,–মিস প্যাটারসন, এটা যে আপনার পক্ষে ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা তা আমি বুঝতে পারছি। যে অপরাধ আপনি করেননি তাতে আপনাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমি সেটাই আদালতকে জানাতে চাই।– অ্যাশলে অপলকে তাকিয়ে থাকে। ডেভিড আবার বলে,–আপনি ডেনিস টিব্বলকে চিনতেন?–হ্যাঁ, আমরা গ্লোবালে একসঙ্গে চাকরি করতাম।–কবে তাকে শেষ দেখছেন?– যে রাতে সে খুন হয়। অফিস ছুটির পর ওর কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে ওর ফ্ল্যাটে আমায় নিয়ে গিয়েছিল।–রিচার্ড মেলটনকে

চিনতেন আপনি?– অ্যাশলে বলে,–না।– ডেভিড জুরিদের দিকে তাকায়। আবার প্রশ্ন করে অ্যাশলেকে,–সানফ্রান্সিসকোতে শিল্পী রিচার্ড মেলটন খুন হন এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ আপনার আঙুলের ছাপ এবং ডি. এন. এ. এর নুমনা পেয়েছে। অ্যাশলে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে বলে,–আমি কিছু জানি না। আমি ওঁকে চিনতাম না।–

একটু থেমে অ্যাশলেকে আবার প্রশ্ন করে ডেভিড,–স্যাম ব্লেক?– অ্যাশলে বলে,–আমি ওঁকে খুন করিনি?– ডেভিড বলে,–আপনি কি জানেন আপনার মনের ভেতর আরও দুটি সক্রিয় সত্তা আছে?–এই মামলা শুরুর কয়েকদিন আগে জানতে পারি। ডাঃ রয়েস সালেম আমাকে পরীক্ষা করে একথা জানান।–

আপনি কি আপনার মনের মধ্যে বাস করা এই দুই অলটার ইগোকে বিশ্বাস করেন?– হ্যাঁ, এইসব খুনের ঘটনাগুলো ওরাই ঘটিয়েছে।–তার মানে ডেনিস টিব্বলে আপনার সহকর্মী ছিলেন। তাকে খুন করার কোন মোটিভ থাকতে পারে না আপনার। এ কথাই তো বলছেন?–হ্যাঁ।–রিচার্ড মেলটনকে আপনি চিনতেন না। তাই তাকে খুন করার কোন প্রশ্নই নেই। আর ডেপুটি শেরিফ স্যাম ব্লেক তোতা আপনাকে নিরাপত্তা দিতেই আপনার ফ্ল্যাটে রাতে ছিলেন তাই তাকে খুন করার কোন পরিকল্পনা কখনোই আপনার থাকতে পারে না। তাই তো?– অ্যাশলে শুকনো গলায় বলে,–ঠিক তাই।–

এবার মিকি ব্রাননানের প্রশ্ন করার পালা। তিনি বলেন,–মিস প্যাটারসন, ডেনিস টিব্বলের সঙ্গে সে রাতে আপনার যৌনমিলন হয়েছিল কি?– অ্যাশলের দৃঢ় গলায় জবাব দেয়,–না।–রিচার্ড মেলটন আর স্যাম ব্লেক-এর সাথে কি খুনের রাতে আপনার যৌনমিলন ঘটেছিল?– অ্যাশলে প্রতিবাদ করে,–না।– ব্রাননান বলে,–কিন্তু ঘটনা হল মৃত

তিনজন পুরুষই খুন হওয়ার আগে যৌনমিলন করেছিল এবং ঐ তিনজনের শরীরে পাওয়া যোনিরস ও আপনার যোনিরসের নমুনা হুবহু মিলে যাচ্ছে। আসলে কেউ আপনার যোনিরস সংগ্রহ করে ঐ তিনজন পুরুষের যৌনাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছে। এ তো খুব সহজ ব্যাপার, তাই না?–

সারা আদালত জুড়ে তখন চাপা হাসির শব্দ। ব্রাননান বলেন তার আর কিছু প্রশ্ন নেই।

ডেভিড বলে,–মাননীয় বিচাপতি, আমি আপনার কাছে অভিযুক্তকে সম্মোহিত করার অনুমতি চাইছি।– বিচারপতি কড়া চোখে তাকিয়ে ডেভিডকে বলেন,–আমি এই বিচারকক্ষকে সার্কাসের মঞ্চ বানাতে দেব না। অনুমতি আমি দেব না।– ডেভিড চেঁচিয়ে ওঠে,–কিন্তু অনুমতি দিতেই হবে। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।– বিচারপতি কড়া গলায় বলেন,–অনুমতি দিতেই হবে? আপনি কি আমায় আদেশ করছেন। ব্যবহার সংযত না করলে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করব।– ডেভিড বলে,–দুঃখিত। ক্ষমা করবেন।– বিচারপতি বলেন,–আপনার কিছু প্রশ্ন থাকলে করুন।– ডেভিড বলে,–অ্যাশলে, আমি চাই টোনি আর অলিটটে–তোমার আরও দুই সত্তাকে তুমি সবার সামনে প্রকাশ করে দাও।–আমি তা পারব না।– ডেভিড জোর গলায় বলে,–তোমাকে পারতেই হবে। আমি জানি তুমি পারবে। টোনি, বের হয়ে এসো। অলিটটে বের হয়ে এসো। তোমরা তো জানো অ্যাশলে নির্দোষ এবং তোমাদের করা অপরাধের জন্য অ্যাশলে শাস্তি পাবে এটা হতে পারে না।–

আদালতে স্তব্ধতা। অ্যাশলে ডেভিডের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে ছিল। ডেভিড আবার চেঁচিয়ে ওঠে–শেষবারের মত বলছি, টোনি, অলিটটে বের হয়ে এসো। কি হল...কথা

শুনতে পাচ্ছো না?– বিচারপতি কঠোর স্বরে বলেন,–মিঃ সিঙ্গার, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম এটা নাটকের মঞ্চ নয়। আদালতের কার্যধারা ভঙ্গ করার দায়ে এবার আপনাকে অভিযুক্ত করতে বাধ্য হব। আপনার তরফের আর কোন সাক্ষী আছেন কি? তাহলে আজ আদালতে কার্য সারণী শেষ হল।–

ডেভিড হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে। সব শেষ হয়ে গেল। অ্যাশলেকে মরতেই হবে।

.

২১.

আদালতের কাজ শুরু হল। বিচারপতি টিসসা উইলিয়াম একবার ব্রাননান, একবার ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বলেন,–অভিযোগকারী পক্ষ তাদের বক্তব্য জানাতে প্রস্তুত কি?– ব্রাননান বলে,–হ্যাঁ, ইওর অনার।–বেশ, বলুন।– ব্রাননান নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করে। –আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে অভিযুক্তের অপর সত্তা এই অপরাধ ঘটিয়েছে তাহলে একটা ভুল করা হবে। ভবিষ্যতে এই পথ ধরে বহু অপরাধী পার পেয়ে যাবে। অল্টার ইগোয় আক্রান্ত হওয়ার ফায়দা তুলে বহু কুখ্যাত অপরাধী মুক্ত হয়ে যাবে। তারা খুন, ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ করে বলবে আমি করিনি, আমার অল্টার ইগো ঐ সব অপরাধ করেছে। মাননীয় বিচারপতি, আমরা সবাই প্রাপ্তমনস্ক এবং বুদ্ধিমান অভিজ্ঞ। আমাদের এখন স্থির করতে হবে আমরা এই অপ্রমাণিত মিথ্যে ফ্যানটাসিকে মেনে নেবো কি-না।–

বিচারপতি এবার ডেভিডকে বলেন,–এবার আপনি আপনার অন্তিম বক্তব্য পেশ করুন।– ডেভিড মনের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা নিয়ে বিচারপতি ও জুরিদের টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়।

–আমাদের সকলের পক্ষেই এই মামলা অত্যন্ত কঠিন। সরকারি আইনজীবীর কথা আংশিক সত্যি। এটা একটা ঐতিহাসিক মামলা। একদল মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এম. পি. ডি. অসুখটির অস্তিত্ব মানেন না। আবার একদল চিকিৎসক ঐ অসুখটির অস্তিত্ব মানেন, চিকিৎসা করেছেন এই অসুখে আক্রান্ত রোগীদের। সেক্ষেত্রে অ্যাশলেকে সাজা দিলে সেটা কি ঠিক হবে? খুনের মত জঘন্যতম অপরাধের শাস্তি কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে দেওয়া ঠিক নয়। পুলিশ বলছে প্রতিটি খুনের জায়গায় তারা অ্যাশলের আঙুলের ছাপ এবং ডি. এন. এ. নমুনা পেয়েছে। এটা একটা চরম অসঙ্গতি। কোন খুনি কি এতটাই বোকা হবে যে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাজিয়ে রেখে আসবে? আমার আর কিছু বলার নেই।–

বিচপারপতি এক ঘন্টার জন্য আদালত মুলতবি ঘোষণা করলেন।

একঘণ্টা পরে আবার আদালতের কাজ শুরু হল। ডেভিড অ্যাশলের পাণ্ডুর, বিবর্ণ মুখের দিকে তাকায়। বিচারপতি জুরিদের দিকে তাকালেন। জানতে চাইলেন,–আপনারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন?– জুরি প্রধান বলেন,–হ্যাঁ, মাননীয় বিচারপতি।– তিনি একটি ভাজ করা কাগজ তুলে দিলেন বিচারপতির হাতে। বিচারপতি কাগজটা খুলে পড়ে বেলিফকে বললেন–এটা সকলকে পড়ে শুনিয়ে দিন।– বেলিফ পড়তে শুরু করলেন–অ্যাশলে প্যাটারসন বনাম ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য মামলা। অভিযুক্ত অ্যাশলে প্যাটারসনকে পেনাল

কোড ১৮৭ ধারায় ডেনিস টিব্বলে, ডেপুটি শেরিফ স্যাম ব্লেক এবং রিচার্ড মেলটনকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হল। এই খুনগুলিকে আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জে অভিযুক্ত করেছি।– ডেভিড অ্যাশলের দিকে তাকায়। দুচোখ বন্ধ করে স্থানুর মত বসে আছে। বিচারপতি গম্ভীরভাবে বললেন,–আদালতের কাজ মুলতুবি হচ্ছে। আগামী পরশু সাজা ঘোষিত হবে।–

বিনিদ্র ডেভিড সে রাতে ভাবছিল কোথায় ভুল হয়েছিল তার? ওর মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল একটা স্বর–অ্যাশলেকে এভাবে মরতে দিতে পার না তুমি। ঐ অহঙ্কারী মহিলা (বিচারপতি)-কে জিততে দিও না। বিচারপতির সেই কথা- আমার আদালত কক্ষকে আমি সার্কাসের এরিনা বা নাটকের মঞ্চ বানিয়ে তুলতে দিতে পারি না।– কথাগুলো কি এক তীব্র সংকেত? –আমার এই আদালত ঘর–।

ভোর পাঁচটায় ডেভিড দুটো ফোন করে। পূর্ব দিগন্তে তখন সবে সূর্য উঠছে।

সকাল ৯টা নাগাদ ডেভিড ওয়েভ গুই-চি তে একটা অ্যান্টিকের দোকানে ঢোকে। ভাজ করা চিনা পর্দা দেখতে চায়। দোকানদার বেশ কিছু চিনে পর্দা দেখায়। ডেভিড তার থেকে একটা নিয়ে বলে,–এটা নেব।–

ডেভিড এরপর একটা বাসনপত্রের দোকান থেকে একটা নিখাদ ইস্পাতের ছুরি কিনল।

আধ ঘণ্টা পরে আদালত বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। দারোয়ানকে বলে,–আমি, অ্যাশলে প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করব। বিচারক গোল্ডবার্গ-এর ঘরটা আমি ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছি।– দারোয়ান সম্মতি জানাল।

ডেভিড বিচারপতি জেফ গোল্ডবার্গের চেম্বারে প্রবেশ করে দেখে ডাঃ সালেম এসে গেছেন। তিনি বলেন, ইনি হিউ ইভারসন। আপনি যা চাইছেন সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।– দুজনে হাত মেলায়। –ঘরের কোণটা আপনার কাজের পক্ষে ঠিক হবে।–চমৎকার হবে।– ইভারসন দ্রুত কাজ শুরু করে। একজন মহিলা কারারক্ষী অ্যাশলেকে পৌঁছে দিয়ে যায়। –বস অ্যাশলে। ডাঃ সালেম তোময় শেষ বারের মত সন্মোহিত করবেন।–কী লাভ তাতে? সবতো শেষ হয়ে গেছে।–কে বলল। আমাদের এখনও জিতবার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে।–

ডাঃ সালোম এগিয়ে আসেন। দশ মিনিট পর অ্যাশলের দুচোখ বুজে আসে। –টোনি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।– ডেভিড চেঁচিয়ে ওঠে। –অলিটটে, তোমার সঙ্গেও কথা বলতে চাই। বেরিয়ে এস তোমরা।– কোন প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না।–তোমাদের জন্য নির্দোষ অ্যাশলে কি সাজা পাবে?– তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ডাঃ সালেম। হতাশ চোখে তাকালেন।

পরদিন আদালতের কাজ শুরু হতে বিচারপতি আসন গ্রহণ করলেন। ডেভিডের হাতে বিরাট ব্যান্ডেজ। সে বলল,–মাননীয় বিচারপতি আমি আদালতের কাছে এই মামলায় একজন সাক্ষীকে পেশ করতে চাই।–না, এখন আর তা হবে না। সাক্ষ্যদান পর্ব শেষ হয়ে গেছে। জুরিরাও মতামত জানিয়ে দিয়েছেন। এবার আমি রায় জানাব।– ডেভিড হেসে বলে,–আমি জানতাম মাননীয় বিচারপতি এর বিরোধিতা করবেন। তাই গতকাল আইনমন্ত্রক থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে রেখেছি।– খাম বন্ধ অনুমতি পত্রটা বিচারপতির হাতে তুলে দেন ডেভিড। বিচারপতি অবাক হয়ে যান। ডেভিড যে এতটা মরীয়া হয়ে

উঠবে ভাবেননি। বলেন,–ঠিক আছে। তবে আধঘণ্টার বেশি সময় দেওয়া যাবে না।– ডেভিড বলে,–তাই যথেষ্ট।–

তারপর ডেভিড বিচারপতি ও জুরিদের বলে,–আমি আপনাদের একটুকরো চলচ্চিত্র দেখাবো।– সবাই অবাক হয়ে তাকায়। ডেভিড আদালতের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ডাকে–আসুন।– হিউ ইভারসন উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে আসে। তার হাতে ষোল মিলিমিটার চলচ্চিত্র পর্দা আর বহনযোগ্য প্রজেক্টর। ডেভিড বলে,–ঐ কোণে রাখুন ওগুলো।– ইভারসন প্রথমে ভাজ করা পর্দাটা টাঙায়। তারপর পর্দার মুখোমুখি আট দশ ফুট দূরত্বে প্রজেক্টরটা বসায়। প্লাগটাকে দেওয়ালের সুইচবোর্ডে আটকে দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু করে। ডেভিড বলে–ঘরের সব বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে দিয়ে জানলার পাল্লা টেনে দিতে হবে।– বিচারপতি তাই করতে নির্দেশ দিলেন। গভীর অন্ধকার হতে প্রজেক্টর চালু করা হল।

কয়েক মুহূর্ত পর্দা জুড়ে চৌকো আবছা আলোর উপস্থিতি। তারপর ভেসে ওঠে ছবি। অ্যাশলে সম্পূর্ণভাবে সম্মোহনের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। ডেভিড এগিয়ে এসে বলে,– টোনি, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। ডেভিড ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,–কি ব্যাপার। তোমরা কি ভয় পাচ্ছ?– বিচারপতি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন,– মিঃ সিঙ্গার আপনার এই পাগলামি বন্ধ করুন। আমি এবার রায় জানাবো।– ডেভিড নিজের এক্তিয়ার ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে,–পুরো ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি। এর পরই সারা ঘরে এক গানের সুর ছড়িয়ে পড়ে।

–A Penny for a spool of thread,

A Penny for a needle,
Thats the way the money goes,
Pop! goes the weasel.

বিচারপতি উইলিয়াম ধাঁধা লাগা হতবাক চোখে পর্দার দিকে তাকান। পর্দা জুড়ে অ্যাশলের মুখ যা পরিবর্তিত। যেন কোন অচেনা নারীর। সে অ্যাশলের থেকে আলাদা কণ্ঠস্বরে বলে,–আমি টোনি প্রেসকট, আমি আদালতে বের হতে ভয় পেয়েছি? তুমি আমাকে কি ভাবো?– বিচারপতি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ঘরে হাজির সকলেই পর্দায় তাকিয়ে থাকেন বিস্ফারিত চোখে। টোনি বলে চলে,–অলিটটেও খুনগুলো করেনি। অ্যাশলেও খুনগুলো করেনি। করেছি আমি। ওদের মৃত্যুই প্রাপ্য। ওরা সবাই আমার সঙ্গে যৌনমিলন চেয়েছিল। আমি সেটা দিয়েছি। কিন্তু বদলে ওদের মরতে হয়েছে।– টোনি হঠাৎ একটা শব্দে ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে আসে, ক্যামেরাটা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে,–তুই আমাকে ফাঁদে ফেলেছিস!– ছুরিটা তুলে নিয়ে ডেভিডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডান হাতে ছুরিটা গেঁথে যায়। মেয়ে হলেও তার শরীরে এখন অমানুষিক শক্তি।

জেল রক্ষীটি ঘরের বাইরে থেকে ভেতরে এসে টোনি বা অ্যাশলেকে ধরতে যায়। তার ধাক্কায় সে ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে পড়ে। ডাঃ সালেম বলতে থাকেন,–অ্যাশলে ওঠো, জেগে ওঠো, জেগে ওঠো।– অ্যাশলে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে।

বিচারপতি এখন বলে–এম. পি. ডি. অসুখটির অস্তিত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে। মানসিক অসুস্থতার কারণে আমি তাকে মুক্তি দিলাম।–

অ্যাশলে জল ভরা চোখে জেলে বসেছিল। ডেভিড ওর হাতে চাপ দিয়ে বলে,–আমি তোমায় বিশ্বাস করি। মানসিক হাসপাতালে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার নতুন জীবন শুরু হবে।